ভিখারিণী-শৈলা।

ভীমসিংহ ও বতনেরতন প্রণেতা

শ্রীকানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীমহেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ।

ফাল্গুন ১৩২৫ সাল।

কলিকাতা।

মূল্য ৸০ মাত্র।

ভূমিকা

গত বৎসর বোধ করি এমনই দিনে "ভিখারিণী শৈল" প্রকাশিত হইবে বলিয়া কয়েকদিন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তখনকার প্রকাশক মহাশয় বাঁকিয়া বসাতে কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। প্রথম উদ্যমে একটা বাধা উপস্থিত হইলে সে বাধা ঠেলিয়া উঠিতে দেরী লাগে। তাই ভিখারিণী শৈল এতদিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য ক্রটী যাহারই হউক, আমিই তাহার মার্জ্জনা চাহিয়া লইতেছি।

বিনীত— শ্রীকানাইলাল সেনশর্ম্মা।

১০৯, বলরামদের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ ।

মাতৃচরণে ।

উপহার।

ভিখারিণী শৈল উপহার দিলাম।

ভিখারিণী-শৈল

শৈলবালা যখন নববধূবেশে আলতারঞ্জিত পা দুখানি লইয়া একগলা ঘোম্‌টা দিয়া শ্বশুর গৃহের সদ্য-পরিষ্কৃতপ্রাঙ্গনে প্রথম পদার্পণ করিল, তখন হইতেই তাহার মাস্‌তুত দেবর ক্ষিতীশের কুদৃষ্টি তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। শ্বাশুড়ী ভিন্ন শ্বশুর বাড়ীতে তাহার ভার লইবার অন্য কোন লোক ছিল না। স্বামী সুরেন্দ্রনাথ বি,এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় চাক্‌রী করিতেন; অবস্থা ভাল নহে, মাহিনার টাকাটায় মাসগুলা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়—কিন্তু একপয়সা উদ্বৃত্ত হয় না তাহার উপর পুত্রের চরিত্র খারাপ হইলে সংসার আর চলিবে না তা'ছাড়া বংশের কুকীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। এই ভয়ে জননী বড় লোকের ঘর দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন, যাহাতে শ্বশুর একজন মুরুব্বি হইয়া বিপদে আপদে জামাইকে রক্ষা করিতে পারেন।

শৈলবালা বড় লোকের ঘরের মেয়ে—তাহার পিতা এক গা গহনা দিয়া তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহার স্বভাবটী নির্ম্মল জলের মত। সাধারণ বড় লোকের মেয়ের মত তাহার অহঙ্কার গুরুজনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া যাইত না—মৃদু স্বভাবটির জন্য সে শ্বাশুড়ীর খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সুখে দুঃখে সে শৈলের মতই অচঞ্চল ছিল। সমস্ত দিন সে সংসারের খুঁটিনাটী কাজ করিয়া বেড়াইত। কখনও কেহ তাহাকে পরিশ্রান্ত হইতে দেখে নাই। সমস্ত দিন কাজ করিয়া তাহার মুখখানি যখন রাঙ্গা হইয়া উঠিত, তখন শৈল'র শ্বাশুড়ী তাহাকে সযত্নে কাছে বসাইয়া বিশ্রাম করাইতেন।

(১)

"ছেলেটাকে দেখো ; ঐ একমাত্র ভার তোমায় দিয়ে চ'ল্লাম"

"অমন অমঙ্গলের কথা ব'লনা—আমার বুক কাঁপে।"

"ভগবানের দেওয়া বিচার সকলকেই মাথা পেতে নিতে হয় নীরদা, এতে আর সুখ দুঃখের হিসাব নেই।"

"ভগবান এমন অবিচার ক'র্বেন না তুমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে।"

ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, আমি বেঁচে থাকতেও তাই, ম'র্লেও তাই। আমার যাবার সময় হ'য়েছে।"

কথা হইতেছিল সুরেন্দ্রের পিতা মাতার মধ্যে। সুরেন্দ্রের পিতা মৃত্যুশয্যায় অভাগিনী পত্নীকে দুইটা শেষ উপদেশ দিতেছিলেন।

'কয় বিঘা নাখেরাজ ডাক্‌লে উত্তর দেয়—জোতজমাটা দখলে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র। ঘরের ভাত, বিশেষ কষ্ট হবে না। ছেলেটাকে পারত' মানুষ ক'র। মরনোন্মুখ স্বামীর পাশে বসিয়া অভাগিনী অশ্রুজলে অঞ্চলসিক্ত করিতেছিলেন আর যুক্তকরে অন্ততঃ এবারটার জন্যও তাহার স্বামীর প্রাণটা ফিরাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। কথাবার্ত্তা অনেক হইল। প্রদীপ নিভিবার সময় অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকেই পূর্ণবাক্‌শক্তি ফিরিয়া পায়। সেই টুকুই জীবনের আশা মনে করিয়া অভাগিনী কত প্রার্থনাই করিল। কিন্তু সমস্ত কাতর প্রার্থনা, অনুনয়বিনয় বিফল হইল। সুরেন্দ্রের পিতা বাঁচিলেন না—প্রদীপ নিভিল।

(৩)

সে আজ সাত বৎসরের কথা। তখন সুরেন্দ্রকে অন্নচিন্তার চমৎকারিত্ব অনুভব করিতে হয় নাই, তখন সুরেন্দ্রের বিধবা জননীকে পুত্রের ভাবী দুর্দ্দশার কল্পনা করিয়া গৃহকোণে অশ্রুজল

ফেলিতে হইত না, বিধবার পুত্রকে কেহ তিরস্কার করিলে স্বীয় দৌর্ব্বল্য স্মরণ করিয়া মনস্তাপে গুমরিয়া মরিতে হইত না। তখন পাঁচজনের মত একজন হইয়া তিনিও নিঃসঙ্কোচে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেন। সেই সময় নিজেদের দুর্দ্দশার দোহাই দিয়া সুরেন্দ্রের মাসী একমাত্র পুত্র আদরের ননীগোপাল ক্ষিতীশকে লইয়া ভগ্নীপতির আতিথ্যস্বীকার করিলেন; এবং সেইখানেই (অবশ্য কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া) বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তখন কি করেন, অগত্যা সুরেন্দ্রের পিতা তাহাদের কিছু জমিজমা কিনিয়া দিয়া বাস করিবার মত একটী অল্পায়তন মেটে বাড়ী করিয়া দিলেন। নিজের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নয়—তাহার উপর আবার দুইজন পোষ্য বাড়িল কিন্তু উপায় নাই হিন্দুরঘরে এসব নিত্যই আছে। হিন্দুরঘরে কেহ অভুক্ত থাকিলে গৃহস্বামী কেমন করিয়া মুখে অন্ন দেন। তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রের ঘাড়ে এই ভার পড়িবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন তাই এই পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবু অনেক বিষয়ে পরিত্রাণ ত' হইতে পারে?

এখন সেদিন নাই—ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুরেন্দ্র মানুষ হইয়াছে কিন্তু অর্থহীন; আর ক্ষিতীশ পশু হইয়াছে, কিন্তু কিছু

পয়সা করিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীকে কতকটা পৈতৃক জায়গা বিক্রয় করাতে তাহার কিঞ্চিৎ অর্থের সঙ্কুলান হইয়াছিল।

(৪)

যাহার যেখানে ঘা, সেই স্থানটাই সে জগতের চক্ষের অন্তরালে রাখিতে চেষ্টা করে—তাই তাহার এতটা মনোকষ্ট শৈলবালা নিজের ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল। সে বড়লোকের মেয়ে চিরদিন আদরেই প্রতিপালিত হইয়াছে, শোক দুঃখের কশাঘাত, সে কখনও সহ্য করে নাই? তাই তাহার বেত্রাহত হৃৎপিণ্ডটা জগতের সম্মুখে ধরিতে তাহার বড়ই লজ্জা করিতেছিল। দিন পবিবর্ত্তন হইয়াছে সংসার পঞ্জিকার পত্রে দুর্ভাগ্যের লিখন প্রতিফলিত হইয়াছে, ভাগ্যাকাশের রং পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে তাহার শাশুড়ী মারা গিয়াছে আর আজই তাহাকে সংসারের যাতনায় অস্থির হইতে হইয়াছে। তাহার স্বামী ক্ষিতীশের কুপরামর্শে একটী পূর্ণ মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অভাবও সংসারে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে। গায়ের গহনা যা'কিছু ছিল বন্ধক হইতে ক্রমে সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এ সব সহ্য হয়, কিন্তু তাহার স্বামীকে মাতাল অবস্থায় বাহিরে রাখিয়া আসিয়া ক্ষিতীশ যে তাহার নিকট অর্থ চাহিবার ছলে আসিয়া প্রলোভন দেখায়, এ দুঃখ এ

লজ্জা যে আর সহ্য হয় না। বলিবার লোক নাই, প্রতিকারের উপায় নাই স্বামী মাতাল কথা কর্ণেও তোলে না। যদি কা সপ্তাহান্তে কোনদিন বাটী আসে মাতাল হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকে, কিম্বা শেষরাত্রে বাটীতে আসিয়া হয়ত' বা বিকট চীৎকার করে, কিম্বা বমি করিয়া ঘরদোর ভাসাইয়া দেয়, কিম্বা টাকার তাড়নায় উদ্বাস্ত করে ; সংসারেত' শৈলবালার এই সুখ। নির্জ্জন বাটীতে তাহাকে দেখিবার জন্য একখানি গহনা দিয়া একটী ছোটলোকের মেয়েকে সে কাছে শোয়াইত। কিন্তু সেত' ছোট-লোক তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? এই অবস্থায় তাহার দিন যাইতেছিল। ইচ্ছা করিলেই সে হয়ত' ইহার কতকটা প্রতিকার করিতে পারিত। সে বড়লোকের মেয়ে পিতাকে জানাইলে হয়ত' তাহার দুঃখের কতকটা অবসান হইতে পারিত। কিন্তু সতীসাধ্বী সে, স্বামীর বিরুদ্ধে পিতার নিকট অভিযোগ করিবে কি করিয়া? স্বামীর হতশ্রদ্ধা অনাদরও যে তাহার আদরের বস্তু। সে যে তাহার নিজেরই স্বামীর দেওয়া। সে সংসার যে তাহার নিজেরই। সেখানে সে স্বামীর অযত্ন ও অশ্রদ্ধাদত্ত একমুঠা অন্ন দিনান্তে পাইলেও পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার স্বামীর ভিটায় সহস্র তিরস্কারেও যে সে স্বাধীনতার গর্ব্ব অনুভব করিত। ধনী পিতার স্নেহের আড়ালে বসিয়া করুণাকণা ভিক্ষা লইতে ত' হইতেছে না? রমণীর এ গর্ব্ব যে বড় গর্ব্ব ;

এইটুকু হারাইলেই যে তাহার স্বত্তালোপ পায় সে বড় গরীব হইয়া পড়ে। তাই শৈলবালা পলে পলে জীবন ক্ষয় করিতেছিল কিন্তু নিজের উচ্চ শির নত করে নাই। অকরুন মাতাল স্বামীর গৃহকোণে বসিয়া নিজের নারীগর্ব্ব লইয়া অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ধনী পিতার বিলাস বৈভব উপভোগ করিতে চাহে নাই। কিন্তু ক্ষিতীশের এই ব্যবহারটা গুপ্ত ঘাতকের ভয়ে ভীত, অথচ কর্ত্তব্যপরায়ন প্রহরীর মত তাহার সন্ত্রস্ত চিত্তটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল।

কিন্তু সংসারে কিছুই গুপ্ত থাকেনা। ভাল হৌক মন্দ হৌক সব কার্য্যের একটা পরিণাম আছে। একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, লোক চক্ষুর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। অনেকদিন কন্যার সংবাদ না পাইয়া কন্যার সংবাদ লইতে মাতা ঝি পাঠাইয়াছিলেন। ঝি শৈল'র চেহারা দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল তাহাকে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিল। কিন্তু শৈল শৈলের মতই অচঞ্চল। কোনও মতে বাপের বাড়ী যাইতে চাহিল না। স্বামীর ভিটায় কেহ নাই তাঁহাকে দেখিবে কে? এ সময় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় ইত্যাদি করিয়া অনেক বুঝাইয়া এবং এই সমস্ত কথা তাহার বাপের বাড়ীতে অপ্রকাশ রাখিতে বহুবার মিনতি করিয়া, পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে; একদিন সুরেন্দ্রনাথ

পুলিসের হাতে পড়িল, তখন কে কাহার মুখ ঢাকা দিবে। টাকার দরকার; গায়ে গহনা নাই ঘরে বন্ধক দিবার উপযুক্ত জিনিষপত্র নাই। স্বামী উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। শৈল হতাশ হইয়া পড়িল। একবার ভাবিল পিতাকে সংবাদ দেয়; কিন্তু এতদিন যে সমস্ত দুঃখ অটল মেরুর মত সহ্য করিয়া নিজের দৈন্যকে বক্ষে চাপিয়া শির উন্নত করিয়া রাখিয়াছিল সেই শৈল আজ কি মুখ লইয়া পিতার নিকট অর্থ ভিক্ষা করে? লজ্জায় তাহার মাথাটা কাটা যাইতেছিল। সে ঈশ্বরের উপর ভার দিয়া অনাহারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

(৫)

জেল হইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত রাগটা পড়িল স্ত্রীর উপর। বেচারা শৈল'র নির্য্যাতনের মাত্রাই বাড়িয়া গেল। শৈল'র পিতা কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট খবর পাইয়া জামাতাকে জেল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শৈল'র ভগবানই সে ভার লইয়াছিলেন।

জেল হইতে বাহিরে আসিলে শ্বশুর তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, এই অপরাধে শৈল'র এই নির্য্যাতন।

প্রথম যেদিন নববধূবেশে সে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসে, সেদিন সে যেরূপ সুখী হইয়াছিল, নবীন জীবনের প্রথম উষায়

তাহার মানস-মুঞ্জরিত সুখতরুর তলে দাঁড়াইয়া প্রথম যেদিন সে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল; আনন্দে অন্ধ বালিকার ভবিষ্যদ্দুঃখের মেঘটা যেমন তাহার দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকিয়া শুধু তাহাকে হর্ষই প্রদান করিয়াছিল, আজ তাহার স্বামীর মুক্তি তাহাকে সেইরূপই আনন্দ দিয়াছিল; অন্ধকার মধ্যে আলোকের একটীমাত্র রশ্মি দেখিলে যেমন বিপন্ন-পথিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, স্বামীর মুক্তিতে শৈলবালাও সেইরূপ আনন্দিত হইয়া উঠিল। নির্য্যাতনের মাত্রাটা যে বাড়িয়া গিয়াছে, এটা তাহার মনে আদৌ রেখাঙ্কিত করিতে পারে নাই। সে যে সংসারে একেবারে নিরবলম্বন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীকে একবার দেখিতে পাওয়া, আর তাহার নিকট হইতে শত তিরস্কার লাঞ্ছনা পাওয়াও তাহার একটা অতিরিক্ত আনন্দের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনান্তে সেটুকুও না পাইলে তাহার অবশ-চিত্তটাকে আর কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিত না সে শত অশ্রুধারে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুব ঝড় উঠিয়াছিল মাটী হইতে শুষ্কপাতা কুড়াইয়া বায়ু আকাশেব গায়ে ছড়াইয়া দিতেছিল, উপরে অলস মেঘখণ্ড দশাননের মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া বেশ একপশলা বৃষ্টি হইবার

সূচনা করিয়া দিয়াছিল। স্বামীর নিকট নির্দ্দয় উপহাসে ব্যথিত হইয়া শৈল'র বুকের ভিতরটা একবার পাষাণের মত কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, আবার বায়ুবেগ সঞ্চালিত বেতসপত্রের মতই কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সব দুঃখ সব যন্ত্রণা সহ্য হয়; কিন্তু তাহার স্বামী যে তাহাকে 'অসতী' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল এইটাই তাহার বক্ষে দারুন আঘাত দিয়াছিল। তাহাকে যে মরিতে হইবে এবং সেইটাই এখন তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছে শৈল তাহা অনেক পূর্ব্বেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন শুধু দরোজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মেঘ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি বালিকা আজকার ঘটনা গুলাই একবার মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া লইতেছিল। এই সময় ক্ষিতীশ তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। স্বামীর সেই কঠোর বাক্যটা তখনও অভিশাপের মত তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছিল। বার-বার হোঁচট্ খাইয়া মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, আর চলা উচিত কিনা পুনরায় চলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া লয়, স্বামীর অত্যাচারে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া শৈলবালা ও জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছিল; কিন্তু সে অগ্রসর হইবে কি পশ্চাৎ হটিবে সেইটাই আয়ত্ত করিতে পারিতে-ছিল না। ক্ষিতীশ যে কখন তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই। ক্ষিতীশও এতক্ষণ উঠানের একপার্শ্বে

দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি শৈলবালার মুখপানে তাকাইয়াছিল, কিছুই বলে নাই। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দিকে নজর পড়িতেই শৈল ক্ষিতীশকে দেখিতে পাইল; সে তাড়াতাড়ী ঘোমটা টানিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল ক্ষিতীশও হতভম্ব হইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

স্বামী ঘরে ঢুকিতেই শৈল এক গাড়ু জল আনিয়া রকের উপর রাখিয়া বলিল "চাক্‌রী-বাক্‌রী ত' ছেড়ে দিলে এখন নেশাটা একটু কম ক'র্লে যে দুবেলার ভাতের সংস্থান হয়" বলিয়াই রান্নাঘরে চলিয়া যাইতেছিল; সুরেন্দ্র বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল "তোমার আর ভাতের অভাব কি? আমি না পারি ক্ষিতীশকে যোগাড় ক'রেছ' সেই ক'র্ব্বে।" কথাটা শুনিয়াই শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল; একটু অভিমান ভরেই বলিল "দেখ অন্যসময় যা' কর, তা'কর, সাদাচোখে ও কথা ব'ল্লে সতীসাধ্বীর অপমান করা হয়—তা'তে যে নরকেও স্থান হয়না।"

"ওরে আমার সতী—" বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ একচড় মারিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্ত দিন মেঘটা গুম হইয়াছিল একটু একটু করিয়া বৃষ্টিটা এইবার ঝাঁপিয়া আসিল।

শৈল পড়িয়াই মূর্চ্ছা গিয়াছিল। যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল—

দেখিল ঘোর অন্ধকারে মাটীর উপরে সে পড়িয়া আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে, উত্থানশক্তি একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। পড়িয়া গিয়া বাঁদিক্কার রগটা কাটিয়া গিয়াছিল তখনও সেখানটা দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। প্রথম জ্ঞানসঞ্চার হওয়ার পর শৈল কিছুই মনে করিতে পারিল না—তাহার সর্ব্ব-শরীরে একটা তরল জ্বালা বহিয়া যাইতে লাগিল যেন একটা উষ্ণ বাষ্প পা হইতে উঠিয়া তাহার মস্তিষ্ক পীড়ন করিতেছিল। সে ভাবিল সে যেন মরিয়া গিয়া নরকে পড়িয়াছে। কিন্তু এমন পাপ সে কি করিয়াছে যে বিধাতা তাহাকে নরকে ফেলিয়া দিলেন এই কথাটা মনে হইতেই সব কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে উঠিয়া শৈল দরোজা ঠেলিল, কিন্তু ভিতর হইতে তাহা রুদ্ধ বুঝিতে পারিয়া সজোরে ধাক্কা দিল, কিন্তু কোনই সাড়া পাইল না ভাবিল একবার ডাকে। কিন্তু যে এই ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়াছে, সে মরিল কি বাঁচিল তাহাও খোঁজ করে নাই ডাকিলেই কি তাহার সাড়া পাওয়া যাইবে? তাহার উপর সে যে একটা ভয়ানক কথা বলিয়া তাহাকে মারিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছে এইটাই তাহার মনে একটা প্রকাণ্ড খোঁচা দিয়া দিল। দরজা হইতে ফিরিয়া শৈল খিড়কীর ঘাটে আসিয়া নামিল।

(৭)

সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার সময় সুরেন্দ্রনাথের কি মনে হইল, একবার আসিয়া খিড়কীর দরোজাটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়াই ফিরিতেছিল, কিন্তু কি মনে হওয়াতে একবার ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আবার ফিরিয়া আসিয়া তেমনই সজোরে দরোজাবন্ধ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না—তবু এর বাড়ী তার বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু কেহই যখন তাহাকে তাহার স্ত্রীর কথা কিছুই বলিল না তখন যেন সকলের উপর রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় ও বাড়ীর রকের উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া ক্ষিতীশের মা বলিলেন "হ্যাঁ সুরেন! বৌমা কোথায় গেল রে? সকালে বাড়ীতে গিয়ে কা'কেও দেখ্‌তে পেলাম না?" সুরেন হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিল শুধু বলিল "কাল সন্ধ্যার পর বাপের বাড়ী চ'লে গেছে" বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ক্ষিতীশদের বাড়ীর কাহারও মুখ দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। মাসীমা কিন্তু একটু বিস্মিত হইলেন—কখন এবং কেন যে শৈল এত হঠাৎ বাপের বাড়ী চলিয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুরেনকে আরও কিছু

জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু সুরেন তখন দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পূজার বাড়ীর একটা দেওয়ালের খানিকটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ক্ষিতীশদের বাড়ীর রোয়াক হইতে তাহাদের সদর দরোজাটা দেখা যাইত। সেটা এতদিন বন্ধ করা হয় নাই এইটাই তাহার আপশোষ হইতে লাগিল। কিন্তু কেন যে ক্ষিতীশদের উপর তাহার একটা বিরক্তি আসিয়া পড়িল তাহা বুঝিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া সে বরাবর আসিয়া ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িল। খাওয়া দাওয়ার কোন আয়োজনই করিল না ; ভাবিল ঘুমাইয়াই দিনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু বিছানায় গিয়াই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে যেন কি একটা ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, তাহার বুকের ভিতরটা কি যেন একটা বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল—কে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে মোচ্‌ড়াইয়া সমস্ত রক্তটুকু বাহির করিয়া লইতেছিল। বেদনায় আকুল হইয়া সুরেন্দ্রনাথ মেজের উপর উপুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কেহ যে মঙ্গল করে তাহার সমস্ত বেদনা মুছিয়া লইয়া আজ আর তাহার কাছে বসিবে না, কেহ যে জননীর মত স্নেহে তাহার ধূলাধূসরিত মস্তকটী ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া দুটা' সান্ত্বনার কথা বলিবেনা, এই কথাটাই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া যাইতেছিল। শৈল মরিল কিম্বা কাহারও সহিত পলাইল, সুরেন্দ্র কিছুই ঠিক

করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না—সে যে তাহার সতীত্ব অপরের পায়ে জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া যাইতে পারে না এই কথাটা হঠাৎ কেন মনে হওয়াতেই তাড়াতাড়ী খিড়কীর ঘাটে আসিয়া পাড়িল কিন্তু মৃতদেহ কোথাও ভাসিয়া উঠে নাই দেখিয়া একগলা জল পর্য্যন্ত নামিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিল, কত ডুব দিল—কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া সিক্তবস্ত্রে গোপাল বাগ্দীর ছেলেকে ডাকাইয়া তাহার শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল; শুধু তাহারা কি বলে সেই কথা শুনিয়া আসিয়া তাহারই কাছে বলিয়া যাইতে। আর কাহারও কাছে কিছু না বলে, সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় কথা শিখাইয়া দিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। তারপর সেই ভিজা কাপড়েই মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই, তাহার উপর দারুণ দুশ্চিন্তায় ক্লান্তমস্তিষ্কে সুরেন্দ্রনাথ জাগিয়া থাকিতে পারিল না, সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

(৮)

যখন ঘুম ভাঙ্গিল সুরেন্দ্রনাথ শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিতেছে; দূরাগত কণ্ঠস্বর ঠিক স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল না। সুরেন ভাবিল বুঝি সে অবেলায় ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে তাই শৈল আসিয়া ভাত খাইবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছে; নিদ্রার পূর্ব্বে যে আকাঙ্খিত বস্তুটীকে একটীবার দেখিবার জন্য প্রাণ কত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটাই যে এত অযাচিত ভাবে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তাই ভাবিয়াই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। গত রাত্রের ঘটনা সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিল—তাহার উপর ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে কাহার আহ্বান কানের কাছে আসিয়া তাহার প্রাণটা তোলপাড় করিয়া দিয়াছিল; সে যে শৈলকে তাড়াইয়া দিয়াছে একথা তাহার আদৌ মনে আসিল না। সে তাড়াতাড়ী উঠিতে চাহিল, কিন্তু গায়ে হাতে দারুণ বেদনা হইয়াছে জানিতে পারিয়াই সে নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিল; দেখিল যে সে ভিজা কাপড়ে মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং কেন যে এরূপভাবে পড়িয়া আছে তাহাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী শ্রীমতী যেমন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেণুরব শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, আর সেই নিত্যশ্রুত, তবু নিত্য-আকাঙ্খিত বংশীরব একবার কানে ঢুকিয়া একেবারে মরমে যাইয়া বসিত, অর্দ্ধজাগরণে সুরেন্দ্রনাথ কাহার আহ্বানবাণী শুনিয়াছিল,—সে যেন কতই আকুল, কতই বেদনা-জড়িত কত দূরাগত, তবু কত স্পষ্ট সেই স্বর, পূর্ণজাগরণে সুরেন্দ্রনাথের মর্ম্মে গিয়া তাই ঢুকিয়াছিল, তাহার মনে হইল বুঝি,

শৈল রাগ করিয়া কাহারও বাড়ীতে লুকাইয়াছিল, বেলা হইয়াছে দেখিয়া আবার আপনিই আসিয়া, খাইবার জন্য তাহাকে সাধিতেছে। প্রথম চিন্তার আবেগে সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল, কিন্তু কোথাও কিছুই নাই, ঘরে দুয়ারে ঝাঁট পড়ে নাই, উনানে আঁচ পড়ে নাই, তুলসীমঞ্চে শুক্‌না পাতা পড়িয়া অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে, রান্নাঘরের দুয়ারে একটা কুকুর শুইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া ধরফর করিয়া উঠিয়া পলাইল। সব যেমন ছিল তেমনই ভাবে পড়িয়া আছে, কোথাও শৈল'র সাড়া নাই। স্বপ্ন ভাবিয়া সুরেন্দ্র আবার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, আবার ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতেই শুনিতে পাইল, বাহিরের দরোজার পাশে তাহার মাসী তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতেছে। সুরেন বলিল "আমার বড় অসুখ, আমি কিছু খাব'না মাসীমা। তোমরা খাওগে" বলিয়াই শুইতে যাইতেছিল; মাসী আবার বলিলেন "সেও বাড়ী নাই, তুইও না খেয়ে থাক্‌বি বাবা! আমি মুখে ভাত দিই কেমন ক'রে বল্‌ দিকিন?" সুরেন ছুটিয়া আসিয়া দরোজা খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "সে কোথা গেছে মাসীমা?"

"কি জানি বাবা। কাল ভোরের বেলা, কোথা থেকে এসে ব'লে আমার বিশেষ দরকার আছে, আমি পাঁচ সাতদিনের জন্য এক জায়গায় যাচ্ছি তুমি ভেবোনা। ব'লেই চ'লে গেল।"

কথাটা শুনিয়াই সুরেন পড়িয়া যাইতেছিল দরজাটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "মাসীমা! আমার মাথাটা বড় ঘুচ্ছে' আমি শুইগে' বলিয়া চলিয়া গেল। দরোজা খোলাই পড়িয়া রহিল। মাসীমা দরোজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘরে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ আছাড় খাইয়া পড়িল জীবনে সে এত দুঃখ কখনও পায় নাই। মা মরিয়া যাইবার পর শৈলই সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহার কষ্টের লাঘব করিয়া আসিয়াছে; অনাহারে অত্যাচারে শৈল কত দুঃখভোগ করিয়া আসিয়াছে কিন্তু প্রকৃত কষ্ট কি, কোনদিন তাহা স্বামীকে একটুও জানিতে দেয় নাই। আজ এই প্রথম নিতান্ত নিরবলম্বন হইয়া সুরেন প্রকৃত কষ্টের মুখ দেখিল। কিন্তু সে কিছুতেই ভাবিতে পারিতে-ছিল না যে ক্ষিতীশের এই অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানটার কারণ কি হইতে পারে? কিন্তু যেটা সবচেয়ে ভয়ানক, মানুষ সেটা মনে করিতেও আতঙ্কিত হইয়া উঠে; সুরেন্দ্রনাথ কিছুই মনে করিতে সাহস পাইল না; তা'ছাড়া তাহার শীত শীত করিতেছিল, জ্বর আসিবে ভাবিয়া কাপড়খানা ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিয়তি তাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে ভাবিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার দুই গণ্ড বহিয়া জল পড়িতেছিল। আজ তাহাকে একবিন্দু জল দিবার পর্য্যন্ত লোক ছিল না; কিন্তু তাহা সে ভাবিতেও পারিতেছিল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে ঘরের বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, রকের উপর সেই গোপাল বাগদীর ছেলেটা ঘুমাইতেছে; তাহাকে জাগাইয়া তুলিতেই সে বলিল্ "দাদাঠাকুর! কালরাত্রে ও পাড়ার হারু মুখুজ্যের ছেলে কল্‌কেতা থেকে এল' কিনা? সে ব'ল্লে হুগলির ইষ্টিষানে গাড়ীতে ধাক্কা লেগে ও বাড়ীর ক্ষিতীশ দাদাঠাকুর মারা গিয়েছে, তেনাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে, ও বাড়ীর মা ঠাকৃরুন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হারুমুখুজ্যের ছেলের সঙ্গে হুগলি গেলেন আপনিও যাও।" সুরেন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; সে ভাবিল আজ তাহার সব আশাই নির্ম্মূল হইল; আর শৈলকে সে ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু শৈল যে তাহার সঙ্গে গিয়াছে তাহারই বা স্থিরতা কি? তাহার বাপের বাড়ীর খবরত' সে এখনও পায় নাই এই ভাবিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল "তুই সেথান থেকে কখন এলি"?

"কাল রাত্রে এসেছিনু দাদাঠাকুর! তা' তোমাকে ডেকে ডেকে তুমি যখন উঠ্‌লেন না তখন বাড়ী ফিরে গেনু। আজ ভোরের বেলাতেই আমি এসে ব'সে আছি। এখনই ওবাড়ীর মা ঠাকৃরুন কাঁদতে কাঁদতে চ'ল্লে গেলেন আপনাকে শীঘ্র যেতে ব'লে দিয়েছে" সুরেন্দ্রনাথ আসল কথাটা না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত

হইয়া উঠিল ; একটু বিরক্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল "সেখানকার খবর কি ?"

"তেনারা সব ভাল আছেন এই চিঠি দিয়েছেন আপনাকে, দিদিঠাকুরুনকে পাঠিয়ে দিতে ব'লেছে" বলিয়া চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া উঠিল। চিঠি তুলিয়া লইবার দরকারও ছিল না, আর সুরেন্দ্রনাথের সে ক্ষমতাও ছিল না ; সে তেমনই হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল ; গৈরিক নিঃস্রাবের মত একটা উষ্ণ রক্তস্রোত তখন তাহার মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া চক্ষু কর্ণ দিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছিল। বালক তাহার ভাবগতিক দেখিয়া প্রস্থান করিল ; কেবল যাইবার সময় বলিয়া গেল "তাহ'লে তুমি যাবেন আমাকে ব'ল্‌তে ব'লে গেছে।" সুরেন্দ্রনাথ মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল ; তাহার মর্ম্মবেদনা আজ যেন তাহার মর্ম্মকে ছিঁড়িয়া দলিয়া পিশিয়া দিতেছিল, আর ভিতর হইতে যেন একটা রুদ্ধ আবেগ প্রতি পঞ্জরাস্থিকে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিতেছিল "ওগো আমার হারাণো-প্রিয়তমা ! তুমি একবার ফিরিয়া এস' একবার এই অনুতপ্ত মাতাল স্বামীকে বলিয়া যাও, যে তুমি তোমার সেই ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতাকে বলি দিয়া তোমার ধর্ম্মের ডালি লইয়া পরের করে তুলিয়া দাও নাই। বলিয়া যাও, যে মরিবার পূর্ব্বে তোমাকে আর না পাই,..

আমার ভাবিয়া মরিতে পাইব।" কিন্তু তাহার কাঁদিবারও সময় ছিল না, কি যেন একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ তাহাকে হুগলির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। শৈল যদি কলঙ্কিনীই হইয়া থাকে তবে তাহার সংবাদ লইব কেন? সে যদি স্বামীকে ছাড়িয়া আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরের সঙ্গে চলিয়া যাইতে পারে তবে তাহার স্বামী তাহার সংবাদ লইবে কেন? এই কথাটা মনে হওয়াতেই সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল ভাবিল "না যাইব না" কিন্তু যতই সে শৈল'র উপর রাগ করুক্ সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই যে সে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; সেই বৃষ্টিতে অন্ধকার রাত্রিতে সে মরিয়া গিয়াছে কিনা তাহারও খোঁজ করে নাই। কিন্তু শোক করিবারও সময় ছিল না; ক্ষিতীশ যে মরিয়া যায় নাই তাহাকে যখন হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই মরে নাই। কিন্তু সে যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে শৈল'র সংবাদটা চিরদিনের জন্য অন্ধকারে থাকিয়া যাইবে ভাবিয়াই সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া হুগলি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু একে দুইদিন অনাহার তারপর কালরাত্রে তাহার খুব জ্বর হইয়াছিল, ভাবিল একটু কিছু খাইলে হইত; কিন্তু খাইবে কোথায়? কে আর রাঁধিয়া দিবে? রান্নার কথা মনে হইতেই রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সেখানে সর্ব্বত্রই শৈল'র স্মৃতি যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে দেখিতে

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ী একখানা কাপড় পরিয়া ঘর হইতে একটু মিছরি মুখে দিয়া একগ্লাস জল খাইয়া গিয়াই গাড়ীতে উঠিল।

(৯)

মরিতে যাইয়াও শৈল কিন্তু মরিল না—ঘাটে নামিয়া তাহার আর একবার স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গেল: সে মরিলে তাহার স্বামীকে অন্নজল দিবে কে? এই ভাবনাটাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল—সে ভাবিল আমি অভাগিনী, চিরদিনই দুঃখ পাইব তাহাতে কষ্ট নাই, কিন্তু আমি মরিলে তাঁহাকে দেখিবে কে? তিনি বেড়াইয়া আসিলে কে তাঁহাকে পা ধুইবার জল দিবে? ক্ষুধার্ত্ত হইলে কে তাঁহাকে খাইতে দিবে? কিন্তু যখনই মনে পড়িতেছিল যে, এই বৃষ্টিতে মূর্চ্ছিত হইয়া সে রাস্তায় বনের মাঝে পড়িয়াছিল—তবু তাহার স্বামী একবার তাহাকে ডাকে নাই তখনই তাহার বক্ষ অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছিল। শৈল ভাবিল আমার ত' মরাই সুখ; স্বামী যখন সন্দেহ করিয়াছেন তখনত" কথায় কথায় এই হইতে চলিল; আমার মরাই দরকার। আমি মরিলে বিবাহ করিয়া তিনি আবার সুখী হইতে পারিবেন।

শৈল একগলা জলে নামিল, এমন সময় পিছন হইতে কে তাহার হাত ধরিয়া টানিল। শৈল মুখ ফিরাইতেই দেখিল, ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশ বলিল "বৌদি, কেন মরিবে? মরিলেইত' সব ফুরাইল; আমার সঙ্গে এস।" শৈল মরিলেই ভাল করিত, কিন্তু তাহার সে সময় মতিস্থির ছিল না সে অনায়াসেই ক্ষিতীশের কথাটা মানিয়া লইল। ভাবিল "সত্যইত' মরিলেই সব ফুরাইল।" সে কিছু না বলিয়া ক্ষিতীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসিল। বাহিরে বাগানের পার্শ্বে ক্ষিতীশ গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল সে বিনা বাক্যে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কাপড় ছাড়িবার জন্য ক্ষিতীশ অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শৈল তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে নাই; সে তখন কি রকম হইয়া গিয়াছিল, গাড়ীর একপার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়াছিল মাথা তুলিয়া একটা কথাও বলে নাই।

(১০)

মাসীমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া হুগলির মেঠো রাস্তা দিয়া সুরেন্দ্র যখন ফিরিতেছিল, তখন যেন কাহার বেদনা-মাখা কাতর-স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া একেবারে হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত দিল; সে যেন একবার গায়কের অসংযত অঙ্গুলিস্পর্শে বীণা যেরূপ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়াই থামিয়া যায়, সেইরূপ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; সুরেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল রাস্তার পার্শ্বে একখানি ভগ্ন কুটীর; তাহারই মধ্যে কে যেন যন্ত্রনাসূচক রোদনধ্বনি করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়া যে গাড়ী পাইল সেই গাড়ীতেই কলিকাতা চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া শ্বশুর মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া সুরেন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল; একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস যেন তাহার চোখ ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল, কোন মতে তাহাকে চাপা দিয়া সে সিঁড়ি হইতে উঠিয়া গিয়া শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিল: কিন্তু সে প্রণামে পূর্ব্বের মত ভক্তি যেন আর আসিতে চাহিল না।

সুরেন্দ্রনাথের আহার করিবার কিছুই ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু শ্বশুরের অনুরোধে আর বন্ধুবর্গের পিড়াপিড়ীতে তাহাকে নামমাত্র আহারে বসিতে হইল; সে যখন শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল

তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। শ্বশুর মহাশয় শৈল'র কথা জিজ্ঞাসা করাতেই সে বলিয়া উঠিল "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে আপনি শুয়ে পড়ুন কাল সকালে সব কথা হবে। আমার বড় অসুখ ক'র্চ্ছে" অগত্যা শ্বশুর মহাশয় চুপ করিয়া গেলেন, সুরেন্দ্র তাহার এক বন্ধুর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

(১১)

সুরেন্দ্রের বাটী হইতে বাহির হইয়া ক্ষিতীশ তাহাদের খিড়কীর ঘাটের পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে শৈল'র অবস্থা সবই দেখিতে পাইল। শৈল যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন সে কাছে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল, কিন্তু তখনও তাহাকে ডাকিতে বা স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। সে দূরে বৃক্ষান্তরালেই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেন্দ্রের খিড়কীর পুকুর একটা দীঘি; তাহার পরপারে একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের একপার্শ্ব একটা বাগানের মত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পার্শ্বেই মেঠো রাস্তা বরাবর চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠাতে একখানি খালি গরুর গাড়ী অগ্রসর হইতে না পারিয়া সেই বাগানে আশ্রয় লইয়াছিল। শৈল যখন জলে না ডুবিয়া ক্ষিতীশের সঙ্গে চলিয়া যাইতে সম্মত হইল, তখন সেই গাড়ী করিয়া তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া কোন দূরদেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

শৈল যখন রেলগাড়ীতে উঠিল, তখন যেন তাহার প্রথম জ্ঞানের সঞ্চার হইল যে সে কি করিতেছে, যখন বৃক্ষশ্রেণী, পরিত্যক্ত মাঠ, দূরে মানুষের আবাসস্থল, তাহাকে যেন উপহাস করিয়াই পিছাইয়া পড়িতেছিল আর যেন বলিতেছিল "তুমি অধঃপাতে যাইবার জন্য অগ্রসর হও আমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া পিছনে পড়িয়া থাকিব।" তখন তাহার প্রাণটা আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল, সে মরিতে পারিল না বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল; আর মনে মনে নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। মানুষের এই রকমই হইয়া থাকে; রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় হাঁটাপথে বা গাড়ীতে পাল্কীতে চড়িয়া আসাতে মনে বড় একটা দুঃখের সঞ্চার হয় না কিন্তু রেল গাড়ী যখন বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে থাকে তখনই প্রথম মনে হয় এইবার বুঝি চিরদিনের মত চলিলাম; এ গাড়ীত' এখনই আমায় কতদূরে লইয়া যাইবে? কেন আসিলাম ফিরিয়া যাই। শৈল'রও তাহাই হইল, সে ভাবিতেছিল কেন মরিলাম না মরিলেত' এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। ক্ষিতীশকে বলিয়া কোন লাভ নাই, যে আজ পাঁচ বৎসর সুযোগ খুঁজিতেছে সে এত হাতে পাইয়া কখনই তাহাকে মুক্তি দিবে না—তাহাকে বলা বৃথা; শৈল ঘোমটার ভিতর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাপড় ভিজাইতেছিল; আর মনে মনে বলিতেছিল "ওগো আমার ঈশ্বর! ওগো আমার অত্যাচারী গুরু! আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও; আমি

কি করিতে আসিয়া কি করিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া যাও ; ওগো! মরিবার পূর্ব্বে তোমার ক্ষমা না পাইলে যে আমার নরকেও স্থান হইবে না। সতীর ক্রন্দন বৃথা হইল না—গাড়ী হুগলির ষ্টেশনে ঢুকিবার পূর্ব্বেই একখানা মালগাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া কোথায় কি হইয়া গেল।

(১২)

মৃত্যুর পূর্ব্বে ক্ষিতীশ সব কথাই প্রকাশ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার এই আত্মপ্রকাশটাই সুরেন্দ্রের হৃদয়ে দারুন কশাঘাত করিয়াছিল ; শৈল'র যে এতদূর অধঃপতন হইয়াছিল সেইটাই সে কল্পনা করিতে পারিত না ; শৈল, যাহাকে সে বসুমতীর মত সর্ব্বংসহা, তাহারই মত ক্ষমাদাত্রী শৈলের মতই সর্ব্বদুঃখে অটল বলিয়া জানিত, তাহার যে এরূপ অধঃপতন হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কি প্রকারে? পুরুষের স্বভাবই এই, যে নিজে দুরন্ত মাতাল কিম্বা বেশ্যাসক্ত হইলেও নিজের স্ত্রী, যাহাকে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পার্শ্বে স্থান করিয়া রাখিয়া দেওয়ার মত সমস্ত সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহাকে দেবতার নির্ম্মাল্যের মতই পবিত্র দেখিতে চায় ; তাহাকে সামান্য মাত্র অশুচি দেখিতে হইলে স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত রক্তটাই বরফের মত শীতল হইয়া যায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা

নয়। স্বামী নিজের কলুষিত আত্মা লইয়া সংসারের বাহিরে থাকিবে, নিজে নরকের পথে নামিয়া যাইবে, কিন্তু স্ত্রীকে গৃহ লক্ষ্মীর পদ হইতে একটু নামিতে দেখিলেই সে শিহরিয়া উঠে; সুরেন্দ্রনাথেরও আজ তাহাই হইল; সব চেয়ে তাহার এই দুঃখটাই অধিক বাজিতেছিল, কেন সে না বুঝিয়া, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্ঠুর প্রহার করিয়া শৈলকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কেনই বা একটাবারও দরজা খুলিয়া দেখে নাই যে, সে কি করিতেছে, সে মরিল কি বাঁচিল। তবে তাহার এই হৃদয়-জোড়া দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল যে শৈল অসতী হয় নাই, আর ক্ষিতীশ বলিয়াছিল যে, তাহার প্রতি কোন আকর্ষণের জন্য শৈল তাহার সঙ্গে যায় নাই; কারণ তাহাহইলে রেলে একটা ধারে বসিয়া সে অত কাঁদিয়াছিল কেন? স্বামীর উপর অভিমানে আত্মহারা হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সে আপনাকে আবর্জ্জনার মধ্যে অঞ্জলি দিয়াছে, যাহার সংসারে থাকিয়া কোন সুখ নাই, জীবনের কোন প্রয়োজন নাই লোক সমাজে স্থান নাই, সে একপাশে ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে পারেনাকি? এই প্রশ্নটার মীমাংসা করিতে না পারিয়াই সে এ কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে, এই কথাটাই সুরেন্দ্রনাথ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল। শ্বশুরকে কি বলিবে এই চিন্তাতেই তাহার সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, ভোরের বেলায় শীতল বাতাসে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,

কিন্তু সকাল হইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রতি প্রভাতে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মেসের বাসাতে কর্ম্ম কোলাহলের যে সাড়া পড়িয়া যায় তাহাতে কে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে? সকালে শ্বশুরের সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হওয়াতেই সুরেন্দ্রনাথ এক নিঃশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িল; শুনিয়া শ্বশুর মহাশয় কিছুই বলিলেন না তাঁহার চক্ষু দুইটী সজল হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্য চাপিয়া ফেলিয়া ব্যাগ ও ছাতা লইয়াই তিনি চলিয়া গেলেন; সুরেন্দ্র অপরাধীর মত একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাঁহার এক-জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল "তোমার শ্বশুর আজই চ'লে গেলেন যে?"

"কি জানি কি দরকার আছে" বলিয়া সুরেন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল; এই বেদনাতুর হৃদয়ে সে একটা কিছুর আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; নির্জ্জনে আসিলেই চক্ষুজলে ভরিয়া যায় আর লোকের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকিতে হইলে তাহার প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। এইরূপে অচল অলস দিনগুলি কাটান' তাহার পক্ষে শুধু কষ্টকর নয়, মহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাছে তাহার এই বিষাদ-কাহিনী ধরা পড়িয়া যায়; কিন্তু অকস্মাৎ তাহার হাতে একটা করিবার মত কার্য্য আসিয়া পড়িল।

(১৩)

— ট্রেন হইতে ছিট্‌কাইয়া ক্ষিতীশ প্ল্যাটফর্ম্মের পার্শ্বেই পড়িয়াছিল, তাহার মস্তকে দারুন আঘাত লাগাতে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। প্রথম জ্ঞানসঞ্চার হওয়ার পর হইতে যে ভীষণ যন্ত্রনা ও নরকের বিভীষিকা তাহার মুখে চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া সুরেনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত হতভাগ্যের বাক্‌শক্তি মোটেই ছিল না; যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে কিন্তু বাক্যে তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য ছিল না; ঘোর রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল আর সমস্ত দেহটা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হইয়া উঠিতেছিল—যেন তাড়িত সংযোগে কে তাহার সমস্ত দেহটা আলোড়িত করিয়া দিতেছিল। নিস্তব্ধ হাঁসপাতালের আলোকময় কক্ষে গভীর রাত্রে এই যমযন্ত্রনা যে কি ভীষণ ও কি করুণ তাহা তা'রচেয়ে আর কেহই বেশী বুঝিতে পারে নাই। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই তাহার বিকার কাটিয়া যায়, তারপর সে সমস্ত কথাই সুরেনকে খুলিয়া বলিয়া চির নির্ব্বানোন্মুখ আঁখি দুটী সুরেনের মুখের উপর রাখিয়া এমনই করুণামাখাস্বরে বলিয়াছিল "এ পাপীকে ক্ষমা কর দাদা।" যে সুরেন হাউ হাউ করিয়া বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

ক্ষিতীশের মৃত্যুর পর ক্ষিতীশের মা প্রথমটা খুবই কাঁদিয়াছিলেন। কোন্ মা না কাঁদে? কিন্তু শোকের প্রথম বেগটা চলিয়া যাইবার পর তিনি উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "না এছেলে মরাই ভাল হ'য়েছে, কেননা সে বেঁচে থাক্‌লে আরও পাপ ক'রে পৃথিবীর শান্তি নষ্ট ক'র্ত্ত। আর তা'র জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট ক'রে ফেল্‌ত। তা'ছাড়া হয়ত' জন্ম জন্ম এই পাপের ভরা নিয়ে তাকে পৃথিবীতে আস্‌তে হ'ত। দুঃখু করিস্ না সুরেন! আমার পেটে এমন ছেলে হ'য়েছে জান্‌লে আমি আঁতুড়ঘরেই তাকে মেরে ফেল্‌তুম, আমি কেঁদে আর পৃথিবীতে পাপের প্রশ্রয় দেব'না। তবে যত পাপীই সে থাকুক, তবু সে আমার ছেলে তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার ক'রতে হবে; বাড়ী চল্ বাবা! আমি আবার তোর সংসার পেতে দি।"

"পাগল হ'য়োনা মাসীমা, বাড়ী যাও; বাড়ীতে তোমার দেখ্‌বার কেউ নাই কিন্তু আজ আর আমি তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনা মাসীমা! তোমার দুঃখের তবু একটা সান্ত্বনা আছে—" বলিয়াই সুরেন চুপ করিয়া গেল। তাহার কথা আর বাহির হইল না।

"মাসীমা বলিলেন" কাঁদিস্ না সুরেন, তোর চেয়ে যে আমার দুঃখুটা বেশী সেটা বুঝ্‌ছিস না কেন? তোর উপর অত্যাচার

করা হ'য়েছে, আর আমিই সে অত্যাচারের কারণ হইছি। আমার দুঃখটা বুঝে তুই নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা কর্ বাবা ?"

হারু মুখুজ্যের ছেলে অতুল ক্ষিতীশের মাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল ; ক্ষিতীশের শেষ কথা সে কিছুই শুনিতে পায় নাই। মাসীকে একজন লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়া সুরেন কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছিল।

(১৪)

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে ; সুরেনদের বাসার সম্মুখে একটা খোলা মাঠ ছিল তারই সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া সুরেন মাঠে ছেলেদের-খেলা দেখিতেছিল, এমন সময় তাহার একজন বন্ধু আসিয়া খুব জোরেই তাহার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল "একটা মহাফ্যাসাদে মেয়েমানুষ হাতে এসে প'ড়েছে সুরেন দেখবি ?" বন্ধুর এই অকৃত্রিম প্রীতিচিহ্নটা তাহার হতভাগ্য পিঠটাকে একেবারে জ্বালাইয়া দিয়াছিল তবু ভদ্রতার খাতিরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সুরেন তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বন্ধু অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন "নতুন বেরিয়ে এসেছে রূপটা তার যেন উছলে প'ড়ছে, কিন্তু কাকেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না—বাড়ীওলিকেও জ্বালিয়ে তুলেছে, সে বেটী এখন দাঁও

খুঁজ্‌ছে, দুশ' তিনশ' হাঁক্‌ছে—তবে গোটা পঞ্চাশ টাকা দিলেই ছেড়ে দেয়; তা' বাবা আমার সে সখ নেই—পাঁচ টাকা খরচ কর্‌লে যে ফুর্ত্তি পাব'—তা'র জন্ত পঞ্চাশ টাকা খরচ ক'র্ত্তে রাজী নই—আর কে বাবা! একটা ছুঁড়িকে ঘাড়ে নিয়ে তা'র হ্যাপা সামলায়—তুই দেখ্‌তে চাস্‌ত' চল্‌ বেশী দূরে নয়—এই শোভা-বাজারের মোড়টাতেই।"

সুরেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তাকে কে এনেছে?"

"কেজানে কে এনেছে। সে বেটা কাঁচা লোক—ছুটো একটা তাড়াহুড়ো খেয়েই স'রে প'ড়েছে এদিকে আর বড় ঘেঁষে না।"

সুরেন একটু অন্তমনস্ক ভাবে বলিল, "কোথা থেকে এসেছে ব'ল্লে?" কে জানে কোন্ বাঙ্গাল দেশ থেকে—কে আর নাম মনে ক'রে রাখে বাবা!" বলিয়া বন্ধুবর ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন। কথাটা বেশী কান না হয় এই ভয়েই যেন সুরেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল; "কাকেও না বলত'—আমি একবার দেখ্‌তে যাই—বেচারা কাঁদা কাটা ক'র্চ্ছে কেন, কথাটা জান্তে ইচ্ছা করে।"

"কাকেও ব'ল্‌ব না হে ব'লব না—তুমি যে ডুবে ডুবে জল খেতে চাও," "তুমি ভুল ক'র্চ্ছ নিশি, আমায় কখনও বেশ্যা বাড়ী যেতে দেখেছ? মদ খেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেছি—কথাটা ব'লেই চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "কুহকে প'ড়ে দিন কতক মাতলামী

ক'রেছিলাম—এখন নাকে কানে খৎ দিয়ে তা' ছেড়েছি" বলিয়া সুরেন উঠিয়া পড়িল। "তাহ'লে দেরি ক'র না—আমি মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়াই" বলিয়া বন্ধুবর নীচে নামিয়া গেলেন।

"আমি এখনই কাপড়টা ছেড়ে আস্‌ছি" বলিয়া সুরেনও কাপড় ছাড়িতে ঘরে প্রবেশ করিল।

(১৫)

মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া সর্পাঘাতে শৈল'র মৃত্যু হইয়াছে এই কথাটাই মাসীমা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে এই ক্ষিতীশের মৃত্যুটা প্রায় এক সঙ্গে হওয়াতেই কুটায় যেন ঠিক থাপ্ খাইতে ছিল না। তবে মাসীমা একটু কৌশল করিয়াছিলেন—তাই তাহার মধ্যে একটা 'কিন্তু'র প্রশ্রয় পাইতে পারে নাই; শৈল'র মৃত্যুটা কিছুদিন পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা ঘটিবার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে; এতদিন দুষ্কৃত পুত্রের উপর রাগ করিয়াই যেন জলভরা মেঘের মত তিনি গুম হইয়াছিলেন; কিন্তু আর ত' চলে না, ক্রমে যেন তাঁহার হাঁপ ধরিয়া উঠিতেছিল; সেই একঘেয়ে খাওয়া শোওয়া আর সংসারের নিত্য আবশ্যকীয় কাজগুলো

কাঁদিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইতেছিল না; কিন্তু মনকে ডুবিয়ে রাখার মত একটা কাজও খুঁজিয়া পাওয়া তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনকে তোলপাড় করিয়া খুঁজিয়াও একটা মন ভোলান' কাজ—একটা বেশ আনন্দ কোলাহলের রেখা কোথাও দেখিতে পাইতেছিলেন না। অথচ এমনই একটা কাজ তাঁহার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সুরেন মাসে মাসে দুই একখানা পত্র দিয়া মাসীমার খবর লইত; কিন্তু আজ তিন চারি মাস তাহায় এক ছত্র লেখা মাসীমার কাছে পৌঁছিল না দেখিয়া, তাঁহার সমস্ত চিত্তটা গভীর অবসাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। ক্ষিতীশ বাঁচিয়া থাকিতে সত্য তিনি সুরেনকে এতটা যত্ন করিতে পারিতেন না, কিন্তু এখন দুই দিক দিয়া সেটা যত অপ্রয়োজন ছিল, ততই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ স্ত্রীলোক একটা কিছু স্নেহের আকর্ষণ না পাইলে মরুভূমির মতই শুষ্ক হইয়া উঠে—এখন তাঁহার পুত্র নাই—সুতরাং তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা মাতৃস্নেহে পূর্ণ হইয়া সুরেনের উপরই আসিয়া পড়িয়াছিল। তার পর এই সুরেনই যে অত্যাচারিত হইয়াছে, সে যে নিরীহ বলিয়া অত্যাচারীর হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই—আর সে অত্যাচারী যে তাঁহারই পুত্র নিজে, এই কথাটা স্মরণ করিয়াই তিনি সহানুভূতিতে গলিয়া পড়িতেন। আর এই সুরেন যে এত বড় আঘাতটা মুখ বুজিয়া সহ্য করিল

তাহার জন্য পৃথিবীর কাহাকেও দোষ দিল না, এই জিনিষটাই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্নেহের আকর্ষণ দ্বিগুণ করিয়া দিল।

এতদিন এক রকম চলিয়াছিল ; কিন্তু প্রায় তিন মাস পত্র বন্ধ হওয়ায়, তিনি ভাবিলেন সুরেন বুঝি তাঁহার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—তাহাকে দুই খানি পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু তাহারও উত্তর আসে নাই।

সেদিন একাদশী, রান্নাবাড়ার প্রয়োজন ছিল না—সকালে স্নান করিয়া আসিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া হরিনামের মালাটী হাতে করিয়া সুরেনের এই কথাটাই তিনি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ওপাড়ার ঘোষালদের ন'গিন্নি আসিয়া বরাবর ঘর হইতে রামায়ণ খানি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, " পড় দিদি, আজ সীতার বিবাহটা "। ভুবনেশ্বরী কি করেন, অগত্যা খানিকটা পড়িলেন—পড়িতে পড়িতে কতকটা শান্তি পাইতেছিলেন বটে, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া সুরেনের কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া যাইতেছিল আর তখনই পড়া বন্ধ করিতেছিলেন। পড়া আজ বেশ জমিতেছে না দেখিয়া ন'গিন্নি বলিল, "দিদির কি আজ মনটা খারাপ হ'য়েছে আজ প'ড়তে পাচ্ছ না কেন ? আহা তা' হবেই ত' একে শোকা-তাপা মানুষ—তা' দিদি ভেবে আর কি ক'র্ব্বে—এই দেখ'না আমরা নিজের আনন্দেই আছি। এগার বছর বয়সে বিধবা

হ'য়েছি—শরীর এমনই জিনিষ দিদি, এখন মনে হয় বিধবা না হ'লে বুঝি গতর থা'কৃত না—এমন ক'রে মাসে মাসে উপোষ না দিলে—বলিতে বলিতেই থামিয়া গেল। ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "না দিদি, সেজন্যে আর দুঃখ ক'রে কি ক'র্ব্ব—ভগবান যা'কে যেমন তৈরি ক'রেছেন—সে তেমনই থাকৃতে বাধ্য—কেবল ভাবছি দিদি, এই সুরেনটা আর বাড়ী মুখো হয় না, এই দুঃখটাই যেন আমার বেশী লাগছে।" ন'গিন্নি বলিয়া উঠিল, "আহা তা' বটেই ত' দিদি, এই বয়সে বাছার আমার এত বড় একটা আঘাত—" বলিতে বলিতেই তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, "তা দেখ দিদি, সেদিন আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিনু, তা' একটি মেয়ে দেখনু, বেশ বড়সড়, ডাগর-ডোগর মুখ চোখ বেশ, আমাদেরই পাড়ায় বাড়ী, সুরেনের সঙ্গে কেন তা'র বিয়ে দাও না। আহা, গরীবের মেয়ে, বাপ কাশীতে থাকে, মেয়েও বাপের কাছেই থাকে মাঝে মাঝে এখানে আসে; সেদিন এসেছে, আমি গিয়েছিলাম তাই দেখলাম। বাপ কাশীতেই কি এক বাবুদের বাড়ী কাজ করে, অবস্থা তত সচ্ছল নয়, তবে মিন্‌সে যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন কোন দুঃখ নাই তার পরেই অকুল পাথার, তবে যদি কিছু রেখে যেতে পারে।" ভুবনেশ্বরী যেন কি একটা খুজিতেছিলেন—অথচ ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, সেই জিনিষটাই যেন মূর্ত্তিমতী

আশা লইয়া একেবারে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন বলিলেন, "তাহ'লে চল' দিদি একদিন নিজে গিয়ে দেখে আসি।"

'বেশ.তঃ চল' না পরশুই যাই।"

"সেই ভাল দেরীতে কাজ নাই—মেয়েটী পছন্দ হ'লে এই সুমুখের মাসেই বিয়ে দিই।"

"তাহ'লে সেই কথাই রহিল, তেরোদশীর দিন খেয়ে দেয়ে দুপুর বেলায় যাব'—আর কতটুকুই বা রাস্তা বড় জোর দেড় কোশ।"

সেই কথাই রহিল—কিছুক্ষণ পরে ঘোষাল গিন্নী বেলা গিয়াছে দেখিয়া এবং বাড়ীতে গিয়া একটু গড়িয়ে নেবার অভি-প্রায়ে উঠিলেন। ভুবনেশ্বরীও একবার বাহিরে আসিয়া শৈল'র সাজানো বাড়ীখানির দিকে তাকাইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন; মনে মনে বলিলেন, "যেই আসুক—আমার সেই শৈল'র মতন কি আর হবে? হতভাগীর এমন কুবুদ্ধি হ'ল—কত দুঃখই যে আবাগীর কপালে ছিল," বলিতে বলিতে আরও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

(১৬)

শৈল মরে নাই। হুগলিতে যখন গাড়িতে ধাক্কা লাগে—শৈল ছিটকাইয়া একটা বনের আড়ালে ঘাসের উপর পড়িয়াই মূর্চ্ছা গিয়াছিল—তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্তও পড়িয়াছিল। সে পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়াছিল তাই কেহ তাহার কোন শব্দও পায় নাই—পাইলে বোধ হয় শৈল মরিত।

সকাল হইবার একটু আগে—তখনও বনান্তরালে অন্ধকার জমিয়াছিল, নীচ জাতির একটি স্ত্রীলোক কাঠ ভাঙ্গিতে আসিয়া গাছের আড়াল হইতে লোক জনের এই সব কাণ্ড দেখিতেছিল; সে পলাইয়া যাইবার সময় শৈল'র পা'টা মাড়াইয়া ফেলিয়াছিল—ফিরিয়া চাহিতেই একটি সুন্দর টুকটুকে মেয়ে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল—সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বক্ষে লইয়া বহুকষ্টে বন দিয়া বন দিয়া নিজের কুটীরে আসিয়া পৌছিল।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া আর ঐ হীন জাতীয়া স্ত্রীলোকের শুশ্রুষায় শৈল'র শীঘ্রই জ্ঞান হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে শৈল যখন কথা কহিতে পারিল, তাহাকে ব্রাহ্মন কন্যা জানিয়া পাড়ার একটী ব্রাহ্মণের মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া তাহার জন্য পথ্য প্রস্তত করাইয়া লইল। দয়া পরবশ হইয়া মেয়েটিও প্রত্যহ শৈল'র আহার প্রস্তুত করিয়া দিয়া যাইত। এই রূপেই অভাগিনী শৈল'র প্রাণ রক্ষা হইল।

(১৭)

প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—শৈল এখন উঠিতে হাঁটিতে পারিত ; নিজে গিয়া নদীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিতে পারিত—নিজেই নিজের অন্ন প্রস্তুত করিয়া লইত—আর কার্য্য অবসরে অশ্রুজলে তাহার কলঙ্ক-কাহিণী ধৌত করিয়া লইত। শৈল'র উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল, বন্যার জলে যেমন সমস্ত ময়লা মাটী ধুইয়া লইয়া যায়—এও তেমনি করিয়া তাহার ভিতরে যেটুকু ময়লা ছিল, তাহা ধুইয়া লইয়া তাহাকে শুদ্ধাচারিণী তপস্বিনীর মত শান্ত করিয়া দিয়াছিল। আগুন না লাগিলেত' কয়লার কালি যায় না। তাহার দুর্ব্বুদ্ধিতে আগুন লাগিয়া তাহাকে ভস্ম করিয়া দিয়া গিয়াছে—এখন যাহা আছে তাহা শুধু চিতা ভস্মের মতই পবিত্র। বৃষ্টির জলে পাথরের ময়লা ধুইয়া গিয়াছিল—বাকী ছিল শুদ্ধ শুভ্র পাথরখানা। তাই সে প্রত্যহ ভাবিত, "ওরে হতভাগী, এটা কেন বুঝলিনা যে সেই নির্ম্মম অত্যাচারের মধ্যে কতটা দয়া কতটা স্নেহ, কতখানি মান ইজ্জত লুক্কায়িত ছিল। মরিতেই যদি পারিলি না তবে-মুখ বুজিয়া সে অত্যাচার সহিলি না কেন? তা' হ'লেত' আজ এমন করিয়া বিশ্বের এই খোলাখুলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত না. তা' হ'লেত' এমন করিয়া সহস্র চক্ষের দৃষ্টির সম্মুখে

দাঁড়াইয়া লজ্জায় আপনার মধ্যে লুকাইতে ইচ্ছা হইত' না, তাহ'লেত' একমুষ্টি অন্নের জন্য পথের ভিখারীর দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে দিনরাত লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইত না।" কিন্তু এ দুঃখেরত' কোন সান্ত্বনা নাই ; অশ্রুর সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিলেও প্রতিকারের আশা নাই, মরিয়া বাঁচিলেও ত' আর ফিরিবার উপায় নাই। সেই মেঠো রাস্তার ধারের কুটীরখানির পাশে বসিয়া শৈল কতদিন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছে, কত সূর্য্যাস্ত হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই পথের ধারে কাহার আকুল আহ্বান শুনিবার জন্য, কাহার শ্রান্তপদধ্বনি শুনিবার জন্য কত-দিনই না উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিয়াছে। কতদিনই না ভাবিয়াছে, এইখানে মরিয়াছি শুনিলেও কি একবার এখানে পদধূলি দিতে আসিবেন না ? কোন্ স্থানটী আমার রক্তে রঞ্জিত হইয়া আমার শেষ-শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছে, একবার কি মনে করিয়া একবার কি তাঁহারই নিজের ভাবিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে "শৈল" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িবেন না ? একবারও কি কলঙ্কিত স্থানটাকে পবিত্র করিতে একটীবার, ভুলেও কি অন্য কোথাও যাইবার জন্য এপথে আসিবেন না ? তাহ'লেত' তাহ'লেত'—কিন্তু কি যে তাহ'লেত' সেইটাই সে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না।

এইরূপে আরও কিছুদিন কাটিল ; তারপরও শৈল তেমনি করিয়া প্রতিপ্রভাতেও সন্ধ্যায় সেই ঘন-বিটপী-ছায়া-সমাকুল পথের

ধারে বসিয়া থাকিত, কিন্তু আর আশার স্মৃতি জাগিয়া উঠিত না। তখন শুধু নিরাশায় সে চক্ষের জল ফেলিত আর মনে মনে বলিত “কেন আসিবেন? যে কলঙ্কিণী হইয়াছে যে আপনাকে পরের পায়ে বিসর্জ্জন দিয়াছে, স্ত্রী হইয়া, সহধর্ম্মিণী হইয়া যে চির জন্মের মত, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি কেন আসিবেন?” কিন্তু এই না আসার সম্ভাবনাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিত। সান্ত্বনার মত কিছুই সে খুঁজিয়া পাইত না। গভীর দুঃখে, অবসাদে, শৈল গাটীর উপর গড়াইয়া পড়িত; আবার তাহার আশ্রয়দাত্রী আসিয়া সযত্নে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইত। শৈল আশা করিতে পারিত না, জানিত তাহার স্বামী আসিবে না, তবু আশা করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিরাশ হইয়া কাঁদাও যেন তাহার পক্ষে একটা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যহ সে গঙ্গারধারে গিয়া নৌকা দেখিত নৌকার আরোহীদিগকে দেখিত; এদেখাও তাহার একটা নেশার মত হইয়া উঠিয়াছিল। আফিমের নেশা যেমন সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইলে মানুষকে অবশ করিয়া ফেলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার গঙ্গাতীরে যাইতে বিলম্ব হইলে তাহার যেন কি হারাইয়া গেল বলিয়া মনে একটা ক্ষোভ হইত। আশা নাই, সম্ভাবনা নাই, তবু সে প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই পথেরধারে বসিত,' মুখ পর্য্যন্ত ধুইবার কথা মনে থাকিত না—আঁখির জলেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইত।

(১৮)

একদিন পুকুরঘাটে দাঁড়াইয়া সেকি ভাবিতেছিল, হঠাৎ নীচে-পানে তাকাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল "ওমা একি হইয়াছে? এ কাহার মুখ জলের উপর পড়িয়াছে" শৈল পিছন ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কি এক বিপুল বিস্ময়ে ও অনুশোচনায় সে জলে বসিয়া পড়িল। "একি? এ তাহার কি মুখ হইয়াছে? বাঁদিককার রগে একটা গভীর দাগ হইয়াছে ডান দিককার কানটা আধখানা প্রায় নাই বলিলেই হয়, তাহার কপালে এতগুলা শিরা উঠিল কোথা হইতে? তাহার মাথার সে ভ্রমরের মত চুলের গোছার পরিবর্ত্তে এত বড় একটা টাক বচনা করিয়া দিল কে?" শৈল অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল "ওরে অলক্ষ্মি, ওরে হতভাগি, তোর যে এমন দিন আসিতে পারে তা' একবার কেন ভেবে দেখিস্ নাই এখন চোখে পড়িলেত্ত যে তিনি আর চিন্তে পার্ব্বেন না।" কিন্তু এত কষ্টেও শৈল কোনদিন তাহার স্বামীকে একখানা পত্র দিতে সাহস করে নাই। কি জানি যদি সে পত্র হঠাৎ অন্য কাহারও হাতে পড়িয়া যায়। স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইবার স্পর্দ্ধা সে রাখিত না সে কথাটা মনে হইয়া মনেই মিলাইয়া যাইত। আর সবার উপরে শৈল এটা খুবই জানিত, যে তাগার স্বামী নিশ্চয়ই

বাড়ীতে থাকিবে না। তাঁহার স্বভাবটা জানিতে ত' তাহার বাকী ছিল না, তিনি যে নিজে একটা পান সাজিয়া খাইতে জানেন না ; শৈল'র মনে পড়িল একদিন, তখনও সে স্বামীর ভালবাসা হারায় নাই তখনও তাহার স্বামী মাতাল হইয়া উঠে নাই, একদিন কি কথায় কথায় ঝগড়া হইয়াছিল বলিয়া সুরেনকে ভাত দিয়া আসিয়া সে দালানে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল সমস্ত বেলাটা কিছুই খায় নাই, পান পর্য্যন্ত সাজিয়া দেয় নাই ; তাই সুরেন নিজে পান সাজিয়া খাইয়াছিল সে পানে এত চুন বেশী হইয়াছিল, যে সুরেন তিন দিন কিছুই খাইতে পারে নাই। আর একদিন জলখাবারের সময় জলের গ্লাসে একটা পিঁপড়ে পড়িয়াছিল বলিয়া সুরেন রাগ করিয়া সে জল ফেলিয়া দিয়া নিজে জল গড়াইতে গিয়া সমস্ত রান্নাঘরের মেজেটা জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে শৈল'র মনে পড়িয়া গেল, একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেনের অসুখ করিয়াছিল, তবু বন্ধুরা আসিয়া ডাকাডাকি করাতে সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছিল, শৈল কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, তবুও সুরেন চলিয়া গিয়াছিল। আসিবার সময় রাত্রে কাচ ফুটিয়া তাহার পা কাটিয়া গিয়াছিল। শৈল কথা কহে নাই বলিয়া সুরেন নিজেই রেড়ীর তেল দিয়া পা বাঁধিতে গিয়া বোতলটা শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল ; শৈল পাছে দেখিতে পায় বলিয়া তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা কাঁচ কুড়াইতে গিয়া

হাত কাটিয়া আরও খানিকটা রক্ত বাহির করিয়াছিল। তারপর শৈল গিয়া বাঁধিয়া দিতেই তাহার গালে একটা চুমু দিয়া সে ঝগড়াটার সেইখানেই নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছিল।

সেদিন অপরাহ্নে পথে বসিয়া শৈল এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল, এমন সময় হীরের মা, তাহার আশ্রয়দাত্রী আসিয়া বলিল "গরীবের কুঁড়েতে ব'সে সোনার অঙ্গ এমন ক'রে কালী ক'র্চ্ছ কেন মা? চল' তোমার বাপের বাড়ীতে রেখে আসি। আবার ঘর পাবে সোয়ামী পাবে, এমনত' কত লোকের হয় মা, যে দোষঘাট ক'রে আবার আদর পায়, সোহাগ পায়, তা'র তুমি ত' সতীলক্ষ্মী এ আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি"; শৈল তাহার জীবনদাত্রীকে অকপটে সব কথাই বলিয়াছিল তাই সে আরও জোর করিয়া বলিল "তোমার মত রাগ ক'রে আমা আমাদের কথা ছেড়ে দাও, ভদ্দর লোকের ঘরেও ত' কম নয় মা? মানুষের গেয়ান কি সব সময় থাকে মা? ঘরের লক্ষ্মী এমন ধারা ক'রে প'ড়ে থাক্‌লে বাবার যে আমার সংসার চ'ল্‌বে না।" শৈল একটু হাসিল, হাসিয়া শুধু বলিল "কেন? এই গরীব মেয়েটাকে দুটো খেতে দিতে কি বড় ভার বোধ হ'চ্ছে মা?"

"ওমা, সেকি কথা, এত' আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি; কোন্ দেবতার দয়ায় আমার কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলো ফুটেছে; তা' ব'লে মেয়ে মানুষ হ'য়ে মেয়ে মানুষের দুঃখটা কি বুঝিনা, না মা!

তোমাকে যেতেই হবে আমি তাঁবা তুলসি হাতে ক'রে, ব'লে, আস্‌ব' তুমি সতীলক্ষ্মী।" "না মা, তাঁকে তুমি জানোনা ; তিনি কিছু না বলুন আমি কোন্ মুখে তাঁর কাছে যাব'? আর তাই যদি পার্ব্ব'না ত' বাপের ঘরে এ কলঙ্কের মুখ দেখিয়ে দুঃখবৈত' সুখ নেই আমি এইখানেই ম'র্ব্ব।"

"বালাই বালাই তা' যা হোক্ হবে, তুমি এখন উঠে এস'মা সন্ধ্যে হ'য়ে এল' আবার বোধ হয় জল আস্‌বে" বলিয়া হীরের মা চলিয়া গেল। শৈল মনে মনে শিহরিয়া উঠিল যে, এই ছোট লোকের মেয়েটা যে এতখানি জোর করিয়া তাহাকে সতীসাধ্বী বলিয়া গেল—সে কি সত্যই তাই ?"

(১৯)

শ্রীচরণেষু,

নরক হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া আমাকে যে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথেই জীবন অতিবাহিত করিতে আমার আনন্দ বৈ দুঃখ নাই, কিন্তু কর্ম্মক্লিষ্ট দিবসের গভীর অবসাদের পর একটুমাত্র আলোক না দেখিলে পাছে পথ হারাইয়া ফেলি, এই ভয়েই অস্থির হইয়াছি ; যে গন্তব্যপথ হইতে এত নীচে পড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে টানিয়া উঠাইলেন ত' একেবারে নিশ্চিন্ত

হইয়া অতদূরে থাকিলে চলিবে কেন? অন্ততঃ একটা উৎসাহের বাণী না শুনিতে পাইলে ভয়েই যে মরিয়া যাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিবেন বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনার পদাশ্রয়ে একরূপ শারীরিক সুস্থ আছি, আপনি কেমন আছেন এবং কবে আসিবেন জানিতে ইচ্ছা করি।"

"পদাশ্রিতা ভগ্নী উষা"

শ্রান্তদেহে বারান্দার উপর একটা ইজিচেয়ারে পড়িয়া এলাহাবাদের বৃক্ষশ্রেণী-বহুল রাস্তার দিকে তাকাইয়া সুরেন ভাবিতেছিল, তাহার এই লক্ষ্যহীন জীবনের পরিণতি কোথায়? এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া তাহার মৌনসমাধি ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। চিঠিখানা পড়িয়া সুরেন সত্যই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, সত্যই সে অনেকদিন এখানে আসিয়াছে আর এই অলস জীবনের এত বড় একটা কর্ত্তব্যকে ছাড়িয়া, তাহাকে অর্দ্ধসমাপ্ত না করিয়াই এতটা নিশ্চিন্ত থাকা যে তাহার কোন মতেই ভাল হয় নাই, এই চিন্তাটাই তাহার হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া দিল। সুরেন প্রায় ছয়মাস পশ্চিমে আসিয়াছে কিন্তু দুই মাসের অধিক সে কাশীতে ছিল না অবশিষ্ট চারিমাস কাল সে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আর এলাহাবাদের একটা বাংলোতে তাহার এই দীর্ঘ-পথ-

প্রবাসের কিছুদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান করিয়া লইয়াছে। একান্তে থাকিতেই সে ভালবাসিত সুতরাং বড় একটা পত্রাদি লেখা তাহার নিশ্চিন্তে-অতিবাহিত দিনগুলির সময়ের অংশ লইতে আসিত না। নিতান্ত দুই একজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেহই তাহার ঠিকানা জানিত না। সে মাসীমাকে পর্য্যন্ত কোন পত্র দেয় নাই; বাড়ীর কথা ভুলিবার জন্যই সে সম্পূর্ণ সচেষ্ট ছিল, তাই কতকটা ইচ্ছা করিয়া ও কতকটা আলস্য করিয়াই বাড়ীতে কিছুদিন কোন পত্রাদি দেয় নাই; তারপর অনেকদিন যখন চলিয়া গেল তখন নূতন করিয়া এই পত্র দেওয়াটা দরকার বলিয়াই তাহার ধারণায় আসে নাই; বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবারও সে অবসর পায় নাই। কিন্তু যে কার্য্যটা কর্ত্তব্য বিবেচনায় সে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই এতটা ত্রুটী করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। বাংলোর বেয়ারাকে ডাকিয়া একটা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়া যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে উঠিয়া পড়িল।

(২০)

বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়াও যখন সুরেনের কোনই সংবাদ পাইলেন না, তখন ভুবনেশ্বরী তাহার জন্য যতই

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, ততই তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া গেল, ভাবিলেন স্থরেনত' তাঁহার পেটের ছেলে নয়, সে কেন তাঁহার সংবাদ লইবে ? কিন্তু তাই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হারু মুখুজ্যের ছেলেকে অনেক করিয়া স্থরেনের বাসায় গিয়া খবর আনিতে বলিয়া দিলেন ; সে আসিয়া বলিল "স্থরেন কাশী গিয়াছে তাহার বাসা হইতে অনেক করিয়া ঠিকানা লইয়া আসিয়াছি," বলিয়া কাশীর ঠিকানা লেখা একখানা কাগজ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। স্থরেন যে প্রাণের জ্বালায় দেশত্যাগ করিয়াছে এই কথাটা মনে হইতেই তাঁহার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া উঠিল, সে যে তাহাকে সঙ্গে লইল না এমন কি একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না, এটাও তাঁহার বুকে তেমনি ভাবে বাজিল। কিন্তু স্থরেন যে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে ফিরাইয়া আনা এখন অনেকটা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে এই ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; ওড়া পাখীকে ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পো'রা সহজ—কেন না তাহার বুদ্ধি বৃত্তি মানুষের নিকট স্বতঃই পরাজিত ; কিন্তু যে সংসারে একটা ঘা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা তত সহজ নয়। সে তাহার বুভুক্ষু চিত্তটাকে বিশ্বের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া একটু শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করে—তাই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া ক্ষুদ্র গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু কার্য্য

অসম্পূর্ণ রাখাটা ভুবনেশ্বরীর প্রকৃতির বাহিরে। তিনি যেমন করিয়া পারেন, সুরেনকে ঘরবাসী করিবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এখন কোন্ পথে যাইবেন, সেইটাই স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। কিন্তু সেদিন বৈকালে যখন মেয়ের বাপ আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল—তখনই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যখন 'আমি আপনার মেয়ে নেব' ব'লেছি—তখন আপনার কোন ভাবনা নাই; সুরেন বিবাহ না করে আমার দেওর-পো'র সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেব; সেও ভাল ছেলে। তবে ভগবানের ইচ্ছার ওপরত' হাত নাই—আপমার মেয়ে যা'র হাঁড়ীতে চাল দিয়ে এসেছে—তার সঙ্গেই হবে।

যে আজ্ঞে—আপনার কথা পেলে অনেকটা ভরসা হয়—ভগবানের হাতত' বটেই, তবে মানুষকে চেষ্টাত' ক'র্ত্তেই হবে। তার পর মেয়ের বরাত"।

আমি সুরেনের কথা নিয়ে এসে, একেবারে দিন স্থির ক'রেই পাঠাব' আপনারা যোগাড় সব করুন। আর যদি তা'র মত কর্ত্তে পারি—তাহ'লে এমাস হ'লে ও মাস ক'র্ব্ব না"।

আচ্ছা তাহ'লে আজ আসি, আর এক দিন এসে খবর নিয়ে যাবো; "ওমা সে কি হয়! আপনি একটু জল টল খাবেন না, মিষ্ট মুখ না করে' কি বাড়ি থেকে যেতে আছে?" বলিয়াই তিনি

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন ; পীতাম্বর বাবু প্রতিবাদ করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইলেন না অগত্যা জুতাটা খুলিয়া দাওয়ার উপর ভাল করিয়া বসিলেন। ভুবনেশ্বরী জল খাবার আনিয়া দিলেন—একটু মুখে দিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। ভুবনেশ্বরী কিন্তু অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন সেইটাই তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিল। মেয়ের বাপকে এতটা ভরসা দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই—সুরেনের একটা কথা পর্য্যন্ত যে তিনি এখনও জানেন না কিন্তু মেয়ের বাপের এই শুক্‌না মুখটাও যে আর দেখা যায় না—ভুবনেশ্বরীর মনে পড়িল, তাঁহার বিবাহের বয়স হইলে বিবাহ দিবার জন্য আকুলিত—বহুদিন পরলোক-গত পিতার সেই মলিন মুখ খানি। স্নেহের প্রতিমা কন্যাকে জীবনের একটা প্রধান অভিসম্পাৎরূপে চোখের উপর বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া দরিদ্র পিতার শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত যে প্রতি নিয়তই তাঁহার ললাট হইতে ঘাম হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত—পুত্রের জননী হইয়াও এতাবৎ কাল সেই দৃশ্যটা ভুবনেশ্বরী ভুলিতে পারেন নাই, তাই মেয়ের বাপকে তিনি আশ্বাস না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু তখনই ভাবিলেন যে এতটা ভরসা দেওয়া বুঝি তাঁহর উচিত হয় নাই—সে বেচারি হয়ত' কতই না আশা করিয়া কাজে কোমর বাঁধিয়া ফেলিবে। তবে তাঁহার একটা আশা ছিল—সুরেন তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিবে না।

'বেলা গিয়াছে দেখিয়া তিনি কাঁধে একখানি গামছা ফেলিয়া পুকুর ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

(২১)

জমিদারদের বাড়ীতে মস্ত একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে—এত দিন পরে তাহাদের হারাণো মেয়ে উষার খবর পাওয়া গিয়াছে। সে কাশীতে এক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে আজ সবে মাত্র পশ্চিম হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিয়াছে। কেহ আনন্দে, কেহ দ্বিধায় কেহ বা অশ্রুজলে, কেহ মুখ টিপিয়া হাসিয়া সমস্ত কালীগঞ্জ গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। হাটে মাঠে ঘাটে এই এক কথাই শোনা যাইতেছিল। রামীর মা. খেঁদির পিশী, হরার খুড়ী প্রভৃতি মহীয়সি সমাজশাসন-কর্ত্রীগণ ব্যাপারটা লইয়া বেশ সোরগোল করিতেছে। খেঁদির পিশী বলিলেন "ওমা, সেই বেউশ্যা ছুঁড়ীকে আবার ঘরে আন্‌বে নাকি? রামীর মা বলিলেন "আর ধর্ম্ম রইল' না—বড় লোকের কাজে কোন দোষ নাই—কে কথা কইবে মা?" হরার খুড়ী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "তাহ'লে বাছা, জমীদারদের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া উঠ্‌লো? পয়সা আছে ব'লেত' লোকে আর জাত দিতে পারে না" ইত্যাদি কথায় কাহারও পেট কামড়াইতে

লাগিল—কাহারও গা বমি করিয়া উঠিল—তিনি খানিকটা বমি করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া মুখ লাল করিয়া ফেলিলেন—বলিলেন "আমার জ্বর এসেছে বাপু, এ সমস্ত পাপ দেশে ঢুক্‌লে কি আর অসুখে বিসুখে দেশ বাঁচ্‌বে? এই কথা শুনেই আমার জ্বর এসে প'ড়ল বাপু—যাই বাড়ী যাই" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অথচ এই সমস্ত সমাজের পরমাত্মীয়াগণ ক্ষণপূর্ব্বেই সমবেতস্বরে জমীদারদের বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছেন "আহা উষা, সে ত' দুধের মেয়ে তা'র আবার কি না দোষ? সে ও ছাই বোঝে কি? কেবল চক্রীর চক্র বৈত' নয়? মন্দ লোকে পরামর্শ দিয়েই এই কাজ ক'রেছে—সে কি আর কেউ বুঝ্‌তে পারে নি?" বলিয়া উষার সংবাদ প্রাপ্তিতে আনন্দিতা জমীদার গৃহিণীর নিকট হইতে আঁচল ভরিয়া মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়াছে। তবে তাহাদের এই বচনের অর্থ তাহারা যেরূপই করিয়া থাক্—আসল কথাটাও তা'র চেয়ে বিশেষ বেশী নয়। তেরো বছরের মেয়ে বিধবা হইয়া উষা যখন বাপ মা'র বুকের কাঁটার মত বাড়ীতে প্রবেশ করিল—তখন হইতেই তাহার আদরটা কিছু বেশী হইয়া গেল। জমীদারের মেয়ে, পয়সার অভাব ছিল না—আদরে আদরে হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথা—দস্তুরমত সংযমকে ডিঙ্গাইয়া চলিতেই সে শিখিয়াছিল। স্নেহ যখন কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে যায় তখনই স্নেহের গলদ বেরিয়ে পড়ে। সে আদরের মেয়ে আদরে

পালিত হইয়া তাহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলাকে পুরুষের ভাবেই গঠিত করিয়া লইয়াছিল। সে নিঃসঙ্কোচে পুরুষের সঙ্গে কথা কহিত—তাহার মাথার কাপড় বড় একটা কেহ দেখিতে পাইত না। উষার একটা বড় সখ ছিল—হরিণ পোষা। সে হরিণ ছানা লইয়া ঘাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইত; এইটাই তাহার কপালে কলঙ্কের কালী ঢালিয়া দিল। উষাদের বাড়ী হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে তাহাদের একখানা প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী ছিল—তাহারই একপাশ দিয়া একটা নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীর এপারে বাগান ওপারে এক বিজন অরণ্য, সেই অরণ্যে অনেক হরিণ খেলা করিয়া বেড়াইত। সদ্যঃ-বিধবা উষা অর্দ্ধেক সময় সেই বাগানে হরিণ লইয়া খেলা করিয়া কাটাইত এমন কি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে সেই বাগানে নদীর ধারে হরিণ লইয়া বসিয়া নদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিত—মাথার উপরে কোকিল পাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়া বৃক্ষ-শীর্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া ছুটিত। জ্যোৎস্না প্রতিবিম্বিত নদীর ধারে সেই শুভ্রবাসা কমনীয়—মূর্ত্তি দেখিয়া বন্য হরিণ শিশু নদীতে জল খাইতে আসিয়া জল খাওয়া ভুলিয়া উষার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। বন-দেবী ভ্রমে কেহবা তাহার হাত হইতে খাবার খাইয়া পলাইত। হরিণ শিশু তাহাকে দেখিয়া একবার না দাঁড়াইয়া, উষাব আহ্বানে

একবার তাহার কাছে না আসিয়া কোথাও যাইতে পারিত না। নদীর উপরে ক্ষুদ্র একটা সাঁকো ছিল—সেই সাঁকোর উপর দিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায়—হরিণের দল উষাদের বাগানে আসিয়া দাঁড়াইত, উষার হাত হইতে খাবার না লইয়া তাহারা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া কোথাও যাইত না।

একদিন গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে ডাকিয়া ডাকিয়া মেঘটা যেন চিত্রার বক্ষের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল—সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই তাহার অন্ধকারটা লুকিয়া লইয়া কে যেন প্রকৃতির অঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত জগৎটাকে ছায়া-ধূসরিত করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃতির এই তাণ্ডব নর্ত্তনে যোগ দিবার জন্যই যেন চিত্রা সোঁ সোঁ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। উষা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে নির্ব্বাক্ দেবী প্রতিমার মত শূন্য পানে চাহিয়াছিল। কোথা হইতে কখন যে হরিণের দল আসিয়া তাহার চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—তাহা তাহার চোখেই পড়ে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ অতি নিকটে অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল—যমরূপী তিন চারিজন অনুচরের সহিত সম্মুখে একজন সশস্ত্র অশ্বারোহী অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া। সে জমিদার লাল মোহন।

জমিদার লালমোহন উষার পিতা হরিমোহনের বিপক্ষ জমীদার; নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে ইহাদের উভয়ের পিতৃ

পুরুষদের মধ্যে জমিদারী লইয়া একটা ছোটখাটো লড়াই হইয়া গিয়াছিল ; সেই সময়ে সরকার হইতে তাহাদের জমীদারী বিভক্ত হইয়া যায়। মাঝখানে চিত্রা নদী তাহাদের জমিদারীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া ছুটিয়াছে। সেই হইতে কলহের পরি-সমাপ্তি না হউক অন্ততঃ বাহিরে আর কোনও গোলমাল বাধেনাই—ভিতরে যাহাই হউক, বাহিরের শত্রুতাটা দুই বংশের মধ্যেই অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। চিত্রার এপারে ঊষাদের বাগান পর্য্যন্ত হরিমোহনের অধিকার—ওপারে বন হইতে লাল মোহনের অধিকার আরম্ভ। নদীর উপরে একটা ক্ষুদ্র সেতু ছিল—শুধু লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য।

(২২)

কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে পিতৃ-হারা হইয়া লাল মোহনের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিটাই প্রশ্রয় পাইয়াছিল—সেটা [illegible] স্বভাব। বড়লোকের বিলাসের অঙ্গ হানি কোন অংশেই হইতে পায় নাই—কারণ যে কোন অংশে একটু ভুল চুক হইবার সম্ভাবনা হইত—পারিষদদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক অমনই তৎক্ষণাৎ এক সঙ্গে নাড়া দিয়া উঠিত—সুতরাং ভুল হইবার কোনই উপায় ছিল না ; একজন ভুল করিবে—কিন্তু বিশজন সে ভুল সংশোধন করিবে

সুতরাং ভুল আর টিকিবে কতক্ষণ! তবে লালমোহনের আর একটা বিলাসিতা ছিল সেটা শীকার। বন্ধুবর্গ শত চেষ্টায় ও এই অকর্ম্মন্য পুরুষ পুঙ্গবটিকে এই পরিশ্রমের কাজ হইতে বিরত করিতে পারেন নাই। সে দিনকার অপরাহ্নের সেই অপরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বহু-দিন-বিস্মৃত শীকার-প্রবৃত্তিটা আবার তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাই সে দু'চার জন সঙ্গী লইয়াই অশ্বপৃষ্ঠে শীকারে বহির্গত হইয়াছিল। বনে ঢুকিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিতে না করিতেই প্রাণ ভয়ে হরিণের দল পলাইয়া আসিয়া তাহাদের আশ্রয় দাত্রী—আলুলায়িত-কেশা শুভ্রবাসা—উর্দ্ধনেত্রা বিশ্বজননী গৌরীর প্রতিমূর্ত্তি উষার চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

(২৩)

নরহত্যা করিতে আসিয়া যদি কোন অস্ত্রধারী পুরুষ সম্মুখে একটা দেবমন্দির দেখিতে পায়—তাহা হইলে সে যেমন মনে মনে চমকিত হইয়া উঠে—মন্দির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভয় মূর্ত্তি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়া যেমন তাহার সমস্ত কল্পনা গুলাকেই গোলমাল করিয়া দেয়—শীকার করিতে আসিয়া সম্মুখে এই দেবী প্রতিমা, নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত,

নিরাভরণা—অথচ আপন সৌন্দর্য্যে প্রকৃতিকে অলঙ্কৃতা করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মানা ঊষাকে দেখিয়া বুঝি পতি-পরিত্যক্তা রাবন-নিগৃহিতা অশোক-বন-বাসিনী জনক নন্দিনীকে মনে পড়িয়াছিল—তাই উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক লালমোহনের ও রক্তস্রোত স্থির ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাই বুঝি সে অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মহিমার সৌন্দর্য্যে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছিল। শত্রুকে এইরূপ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াই যেন হরিণের দল যে যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। সে দিকে লালমোহনের ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসরও ছিল না।

সম্মুখে চক্ষু মেলিতেই এই ভীম বেশধারী অপরিচিত লোকেদের দেখিতেই ঊষার অন্তরাত্মা শুকইয়া গেল—তার উপর সেখানে যে তাহার কেহই রক্ষক নাই—একজন চাকর ও সেদিন তখন পর্য্যন্ত বাগানে আসিয়া পৌছে নাই—এই কথাটা মনে পড়িতেই ঊষা ছুটিয়া গিয়া তাহাদের বাগানের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতরটা তখনও দুরদুর করিতেছিল—আকাশের মেঘটাও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন গুর-গুর করিয়া উঠিতেছিল। জমিদার লালমোহন ফিরিয়া চাহিল—পার্শ্বেই সন্তোষ দাঁড়াইয়াছিল—সন্তোষ তাহার প্রধান পার্শ্বচর। মেঘ করিয়াছে দেখিয়া অগত্যা সকলে নদী পার হইয়া চলিয়া গেল কিন্তু বনে ঢুকিয়াই লালমোহন ডাকিল, "সন্তোষ।"

সন্তোষ যাহা কানে কানে বলিল তাহাতেই উষার জীবনে একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। জমিদার লালমোহন লোকজন লইয়া চলিয়া গেল, রহিল কেবল সন্তোষ। সকলে চলিয়া যাইবার পর সন্তোষ উষাদের বাগানের চারিধারটা একবার ঘুরিয়া লইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বেই একখানি শিবিকা আসিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে।

(২৪)

গাড়ীতে উঠিয়াই উষা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, যখন চক্ষু মেলিল, তখন সবে মাত্র গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উষা ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড় করে, কিন্তু তাহাতে নিজেরই কলঙ্ক প্রচার হইয়া পড়িবে; হতভাগ্য সমাজ ত' নারীজাতিকে ক্ষমা করিতে জানে না, তাই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সে চুপ করিয়া গেল। ভাবিল যেমন করিয়াই হোক্ বাড়ীতে খবর পাঠাইবেই। সন্তোষকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না, উষা ভাল মানুষটীর মতই গিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং নিঃশব্দেই তাহার ইচ্ছামত একটা বেশ্যার বাড়ীতে উঠিল।

(২৫)

সন্তোষ উষাদের বাগানটা অরক্ষিত দেখিয়া আসিয়া তাহার নির্দেশ মত পাল্কী আসিয়াছে দেখিয়া, তাহাদের লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল ; জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিয়া, চাকরের বেশে যেখানে উষা ছিল সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। বৃষ্টি তখন প্রবলবেগেই পড়িতেছিল,—গাঢ় অন্ধকারে লোক চেনা যায় না ; বেচারা উষা তাহাদের বাড়ীর চাকর ভাবিয়া নিঃসঙ্কোচে পাল্কীতে উঠিল। জলের ছাট ভিতরে ঢুকিবে এই ভয়ে নিজেই পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সন্তোষকে আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না। বাগান হইতে বাহিরে আসিয়া কিন্তু সন্তোষের মনে একটা নূতন ভাব আসিয়া জুটিল ; মনে মনে একটা দুরভিসন্ধি আঁটিয়া সে বেহারাদের ষ্টেশনের দিকে চালিত করিল, পাল্কীর ভিতর হইতে উষা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া পাল্কী নামাইয়া সন্তোষ একজন বন্ধুর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিল। উষা পাল্কীর ফাঁক দিয়া ষ্টেশন দেখিয়া চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সন্তোষ টিকিট করিয়া আনিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিল, ষ্টেশন মাষ্টারকে কিছু দিয়া একখানা গাড়ী রিজার্ভ করিয়া সেই রাত্রেই শেষের গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিল. যজ্ঞের হবি কুকুরে মুখে করিয়া লইয়া গেল।

জমিদার লালমোহন দেখিল "পাখী উড়িয়াছে"। এখন নিরুপায় হইয়া ভিতরে ভিতরে কিছু সন্ধান করিয়া যখন কোন তত্ত্বই পাইল না, তখন সে চুপ করিয়াই গেল। জিনিষই যখন হাতছাড়া হইয়া গেল, তখন তাহার জন্য একটা গোলমাল করিয়া বিপক্ষ জমীদারদের সঙ্গে একটা হাঙ্গামা বাধাইতে এবং তাহার জন্য অনর্থক অর্থ নষ্ট ও কষ্ট স্বীকার করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হইল না। তবে সন্তোষের উপর রাগটা তাহার প্রবলই রহিল। একবার হাতে পাইলে জমীদারের ক্ষমতাটা যে তাহাকে দেখাইয়া দিবে, সেটা তাহার মনে মনেই রহিয়া গেল।

(২৬)

সন্তোষ কিন্তু এখানে আসিয়া বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেল, তাহার মত একজন কাঁচা লোক যে কলিকাতার মত সহরে নূতন সুন্দরী মেয়েমানুষ আনিয়া সুবিধা করিতে পারিবে না, তাহা বেচারা ধারণা করিতেই পারে নাই। কাপ্তেনকে যণ্ডরে বাঙ্গাল দেখিয়া অনেক মাতালের দল আসিয়া বেচারীকে ঘেরিয়া ধরিল। সন্তোষ দু'চার দিন একটু এদিক ওদিক করিয়া সরিয়া পড়িল, বিশেষতঃ তাহার হাতে মোটেই পয়সা ছিল না। কিন্তু যাইবার সময় তাহার আপশোষটা এতই হইয়াছিল যে বেচারী কাঁদিয়া

ফেলিয়াছিল। ওদিকে লালমোহনের কাছে তাহার ঘাসজলের আশায় ইস্তফা দিয়াই সে এত বড় কাজটায় হাত দিয়াছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না দেখিয়া "তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল" উভয়ই হারা হইয়া আর এক কুলের আশায় অকুলে তরী ভাসাইয়া দিল।

জীবনে এই প্রথম বিপৎপাতে সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার দূষিত বায়ুতে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, বাড়ীতে যেমন করিয়াই হোক্ খবর দিবে; কিন্তু যখন অনেক খোসামোদ করিয়া অনেক হাতে পায়ে ধরিয়াও সে বাড়ীওয়ালীকে দিয়া একখানা পোষ্টকার্ড আনাইয়া লইতে পারিল না, তখনই সে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রে একটা দৃঢ়তা আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইলেই সে ঘরে কপাট দিয়া পড়িয়া থাকিত; কিন্তু বাড়ীওয়ালী যখন জোর করিয়া তাহার ঘরে লোক দিতে আরম্ভ করিল, তখনই সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা জিনিষ ছিল, যাহা বাড়ীওয়ালীর চক্ষে যাহাই হোক, লম্পটের চক্ষেও একটা ভক্তির ভাব আনিয়া দিত। যখন বাড়ীওয়ালী কিছুতেই ছাড়িল না, তখন সে লম্পটের দ্বারেই মাথা গুঁজিবার স্থান চাহিল। যখনই কোন লম্পট মাতাল অবস্থায় তাহার সম্মুখীন হইত, তখনই তাহার তেজোদৃপ্ত স্বর্ণ

কান্তি একটা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিত "আমাকে দেখিয়া কি বেশ্যা বলিয়া মনে হয়? আমার এই রূপ যৌবনের মধ্যে ভগবান কি এতটুকু পবিত্রতা দেন নাই, যা' দেখে ভগবানের প্রধান সৃষ্টি পুরুষ তোমরা, আমাকে দেখে একটু মাত্র সম্ভ্রম দেখাতে পার'; আমি বিপদে প'ড়ে তোমাদের আশ্রয় চাচ্ছি, আমার মত রূপসী তোমরা অনেক দেখেছ' আমার চেয়ে কত বেশী সুন্দরী, তোমাদের পায়ের তলায় প'ড়ে প্রেম ভিক্ষা ক'রেছে; আজ আমি তোমাদের পায়ের তলায় ব'সে একটু আশ্রয় চাচ্ছি, পুরুষ তোমরা, ক্ষমাই যাদের শক্তির পরিচয়, দয়াই যাদের প্রধান গুণ, নারীকে রক্ষা করাই যাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য, সেই তোমরা—আমার মত অসহায় দুর্ব্বলকে পায়ের তলায় পেয়ে পায়ে দ'লে যেতে চাও, না তা'কে দয়া ক'রে মুক্তি দিয়ে তোমাদের মহত্ত্ব রক্ষা ক'র্ত্তে চাও, বেছে নাও" বলিতে বলিতে যখন প্রভাত সূর্য্যের কিরণস্নাতা উষার দীপ্তিতে উষা তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইত, তখন সেই শিশির-স্নাতা শেফালীর মতই পবিত্র, স্থিরা সৌদামিনীর মতই গর্ব্বোন্নত, শরীরধারিণী শুচির মত সজলনয়না দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া অনেক মাতালের নেশা ছুটিয়া যাইত; লম্পটের দল সসম্ভ্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইত। তারপর সেদিন ঘটনাচক্রে যখন সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল, তখন উষা ভূমিষ্ঠা হইয়া কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছিল,

উঠিয়াই সুরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া এমনই একটা করুণামাখা স্বরে বলিয়া উঠিল "আপনি কে জানি না, কিন্তু ভগবান আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি আমায় একটু আশ্রয় দিতে পারবেন?" যে সুরেন্দ্রনাথ প্রাণের ভিতর হইতে যেন এমনি করুণ প্রতিধ্বনির সাড়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—"হাঁ ভগ্নী পারি, আর আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন বিপদ হবে না, তাও ব'ল্‌তে পারি।" কি জানি উষা কোন্ দেবতার প্রেরণায় এই লোকটার ভিতরকার প্রাণটা দেখিতে পাইয়াছিল, সেই শত-ক্ষত প্রাণটা যে পরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করিবার জন্যই আকুল আগ্রহে ফাটিয়া মরিতেছিল, তাহা বুঝি দেবতাই উষাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাই সে এই দেবমন্দিরেই তাহার আকুল আবেদন এমনভাবে জানাইল, যে তাহাকে আর নিরাশ হইতে হইল না। সেই অচঞ্চল করুণায়-ভরা চক্ষুদুটা বুঝি প্রাণের গভীর ব্যথার পরিচয় দিতে ছিল, তাই তাহার পূজার নৈবেদ্য আসিয়া আপনার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। একটা বিরাট ভক্তিতে, গর্ব্বে, উচ্ছ্বাসে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুজলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া ফেলিল। বড়ই বিপদে পড়িয়া যখন কেহ প্রাণপণ চেষ্টায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে এবং শেষে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিলে সে যেমন ক্ষণেকের জন্য অবশ হইয়া পড়ে, স্বামীর মৃত্যু-

শয্যার পাশে সতী যখন করুণা প্রার্থনা করে, শেষে স্বামীর জীবনের আশা পাইলে কৃতজ্ঞতার অশ্রু যেমন স্বতঃই তাহার চক্ষু রুদ্ধ করিয়া দেয় ঊষারও তাহাই হইল। এক নিঃশ্বাসে এই কথা কয়টি কহিয়া আশ্বাস পাইয়াই সে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, যেন প্রাণভয়ে ভীত হরিণশিশু ব্যাধভয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় দৌড়াইয়া আসিয়া নিজের আবাসস্থলে আসিয়াই অবশ হইয়া পড়ে। সুরেন্দ্র কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ীওয়ালীর নিকট আসিয়া বলিল, "দেখ' আমি পুলিসের লোক, আমি এই মেয়েমানুষটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, নৈলে তোমরা যে রকম অত্যাচার ক'র্চ্ছ, হয়ত' একদিন আমাকেই এসে তোমাদের হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তোমাকে আমি ফাঁকি দিতে চাই না তুমি কি হ'লে একে ছেড়ে দিতে চাও বল?" পুলিসের লোক শুনিয়াই বাড়ীওয়ালীর চক্ষু কপালে উঠিয়াছিল, সে বলিল "আজ্ঞে বাবু আপনারা বড় লোক, গরীবের যাতে লোকসান না হয়," বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সুরেন নিজের হাত হইতে একটী মূল্যবান আংটী খুলিয়া দিয়া বলিল "বাস্ আর কথা ক'য়ো না; এখন তোমার চাকরকে একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল।" বাড়ীওয়ালী গাড়ী ডাকিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল, সেও এই হতভাগা মেয়েটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে, মাঝে হইতে তাহার যাহা লাভ হইল, তাহাই যথেষ্ট। সুরেন ঊষার কাছে

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আমি তোমাকে ভগ্নী ব’লে ডেকেছি, আমার সঙ্গে আস্‌তে যদি ভয় না করে, তবে চট্ ক’রে বেরিয়ে এস, এ নরক থেকে বেরিয়ে পড়ি।” উষা তাহার পায়ের কাছে মাথা [illegible]য়াইয়া বলিয়া উঠিল, “দাদা! এই বিপদে আমি তোমারই আশ্রয় নিলাম, তুমিই আমার মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও” বলিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। সেই রাত্রেই সুরেন তাহাকে লইয়া কাশী চলিয়া আসিল।

(২৭)

রাণী যখন শুনিল যে তাহার অনির্দ্দিষ্ট স্বামীর মাসীমা’র সঙ্গে তাহার বাপ পাকা কথা কহিয়া আসিয়াছে, তখন সে প্রায় আনন্দিতই হইল। কেন না এই বিবাহের জন্য তাহার গরীব বাপ অনেক কষ্ট পাইতেছেন; এমন কি তাঁহার ভাল করিয়া খাওয়া পর্য্যন্ত হয় না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে হইয়া জন্মান’ যে সংসারের বক্ষে প্রকাণ্ড একটা অভিশাপের সৃষ্টি করে, এই কথাটাই তাহার প্রাণে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল, সে সুখে যেন নিশ্বাস ফেলিতেই পারিতেছিল না। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে আনন্দমূর্ত্তির মত হাসিয়া খেলিয়া যত বড় হয়, বাপ মায়ের পেটের ভাতটা ততই অজীর্ণ হইতে থাকে, এই কথাটা সে জ্ঞান হইতেই বুঝিয়াছিল; আর

সে ঐ সময় আড়ালে বসিয়া এই কথাগুলা ভাবিতে ভাবিতেই তাহার চোখ দিয়া জল পড়িয়া যাইত। ছোট মেয়ে সে, জীবনের পথে এখনও একটা পা'ও বাড়ায় নাই, তবু এই দুঃখটা তাহার প্রাণে এত বাজিয়াছিল, যে তাহার এই দোজবরে স্বামীর কথা শুনিয়া সে মোটেই দুঃখিত হয় নাই, বরং তাহার বাপকে বেশী টাকা খরচ করিতে হইবে না বুঝিয়া সে সুখীই হইয়াছিল। সে কল্পনার চক্ষে তাহার ভবিষ্যৎটাকে ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া লইয়া বেশ তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। রাণী শুনিয়াছিল যে তাহার ভাবী-স্বামী দোজবরে হইলেও এখনও তাহার প্রথমবার বিবাহ করিবার বয়স যায় নাই তাহাতেই সে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। আর তাহা না হইলেই বা কি হইত? বাপের রক্ত দিয়া নিজের সুখ ক্রয় করিবার চেয়ে, নিজের সুখের বিনিময়ে সে বাপের দুঃখটাই মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণের ভিতর হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাই তাহার সখীরা যখন তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত "কিলো দোজবরে বর হবে ব'লেই এত আমোদ না জানি আইবর বর পেলে কি কত্তিস্?" রাণী সলজ্জ হাসি চাপিয়া বলিত "বরের আবার দোজবরে তেজবরে কি ভাই? যা'র গলায় মালা দেব' সে যেই হোক্ ফেল্‌তে ত' পার্ব্বো না, আর বাঙ্গালীর মেয়ের কি বর বাছাই করা নিয়ম আছে ভাই? না তাই আমাদের শোভা পায়? নিজের সুখটুকু বিক্রী ক'রে পরের দুঃখ কিনে

নেওয়াই যে আমাদের ধর্ম্ম পরের দুঃখটা নিজের বুক পেতে নিতে শিখলে নিজের বুকখানা যে দশহাত বেড়ে উঠবে।' কথাটা বলিতে রাণীর বুকে অনেকখানি আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কারণ সে ত' জানিত' না যে সুরেন্দ্রনাথ তাহার পক্ষে কোনও রূপে অযোগ্য হইতে পারে না। তবুও তাহার মনের ভিতরের কতখানি অতৃপ্ত সাধকে চিরজীবনের মত অতৃপ্ত রাখিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সে যে স্বার্থত্যাগটা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে, সেই কথাটাই মুখে প্রকাশ করিয়া বলিতে তাহার প্রাণটা বুকের মধ্যে কতবার যে ঘামিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত' কেহ দেখিল না। সখীরা চোখে মুখে একটু টিপিয়া হাসিয়াই তাহার মীমাংসা করিয়া লইল। তারপর কাশী যাইবার দিন যখন সে সকলের নিকট বিদায় লইতে গেল তখন বন্ধুরা কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ বা স্পষ্টই বলিল "দেখিস্ ভাই, মনটা শুদ্ধ যেন তোর বরকে দিয়ে ফেলিস না, প্রাণটা ত' অনেক আগেই দিয়েছিস্" যেন মনটা দেওয়া তাঁহার বিবেচনায় মহাপাপ। রাণী এই নিষ্ঠুর পরিহাসের একটু মাত্র প্রতিবাদ করিল না, সজলচক্ষে বিদায় লইয়া নৌকাতে উঠিল। কিন্তু এত ঠাট্টা বিদ্রূপ যাহার জন্য সে নীরবে সহিল তাঁহার হাঁড়ীতে বুঝি সে চাল দিয়া আসে নাই, তাই তাহার একটা মহত্ত্বের জন্য তাহার এ বিবাহটাই ভাঙ্গিয়া গেল।

২৮ ।

সেদিন সন্ধ্যার আগে হইতেই একটু বেশী বেশী শীত করিতে-ছিল বলিয়া সুরেন এক পেয়ালা চা করিয়া দিতে বলিয়া বারান্দার উপর একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া তাহার জীবনের অতীত কাহিনীগুলা মনের মধ্যে একটু ওলটপালট করিয়া লইতেছিল। সেই চিন্তার স্রোতে, রাত্রির অন্ধকারে দূরাগত ইঞ্জিনের আগুনটা বায়ুবেগে যেমন ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠে, শৈল'র স্মৃতিটাও ঠিক তেমনই ভাবে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া অন্তর্নিরুদ্ধ সর্পের মত ফণা তুলিয়াই আবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কখন যে সুরেনের চক্ষে জল জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা সে মোটেই জানিতে পারে নাই, যতক্ষণ না উষ্ণধারা তাহার গালটাকে পুড়াইয়া দিয়া একেবারে বক্ষের উপর আশ্রয় লইল। সুরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল "হারে হতভাগী এমন লোকের হাতেও হাত দিয়েছিলি," এমন সময় উমা চা লইয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াই বলিল "দাদা, তুমি যখনই একটু অবকাশ পাবে, তখনই নিজের উপর এই রকম অত্যাচার ক'র্ব্বে? ভেবে ভেবে কি শেষে নিজেরও প্রাণটা হারাবে; দেহ ত' মাটী হ'য়েইছে, কিন্তু তাই ক'র্লেই কি তাকে ফিরে পাবে, না তার জ্বালার অবসান

হবে"। "তা হবে না জানি উমা কিন্তু না ভেবেও যে থাক্‌তে পারি না, [illegible] ত' ফাঁকি দিতে পারি না বোন্?"

"[illegible]ন ব'লেছিলাম যে এর কলেরা রোগী, তা'[illegible] বসন্তরোগী নি[illegible] তুমি [illegible]াক্‌তে পারবে না; এখন দেখ্‌ছি তোমার পক্ষে সেইটাই ভাল, তা'তে বিশ্বনাথের মনে যা' আছে ক'র্ব্বেন, মানুষের হাত নেই; কিন্তু এ রকম যে তিল তিল ক'রে ক্ষয়ে যাবে তাতো দেখতে পারি না তা'তে ধর্ম্ম সৈবে কেন?"

"আমার ধর্ম্মে সব সৈবে উষা, এই ধর্ম্মের কথাতেই তাকে তাড়িয়েছি, তা'ড়িয়েছি না মেরেছি রে একেবারে প্রাণে মেরেছি।"

"তা' বেশ, এখন চা'টা খাবে কি? না এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় তাকে জুড়ুবে" বলিয়া উষা পেয়ালাটা কাছে দিয়া দূরে গিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। এই সময় বৃষ্টি আসিতেই সুরেন হাতের ডিশটা ভুল করিয়া কাপের উপর নামাইতেই বাকী চা টুকু সব মাটীতেই পড়িয়া গেল

"চা টুকু সব ফেল্লে ত'? না, তোমায় নিয়ে আর পারি না দাদা" বলিয়াই উষা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেন চায়ের কাপ্‌টার দিকে একবার তাকাইয়া ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই বলিল "বোস্ উষা যাস্‌নে।"

"আর একটু চা নিয়ে আসি দাঁড়াও।"

"না আর ভাল লাগছে না, তুমি ব'স।"

অগত্যা উষা বসিল। সুরেন বলিতে লাগিল "সে দিনেও, এমনই বৃষ্টি হ'চ্ছিল শীতটা বোধ করি এর চেয়েও বেশী, হ'য়েছিল, সেই দিনেই আমি—ওঃ।"

"সে কথা ত' একশ' বার শুনেছি দাদা," একটু বিরক্তভাবেই উষা কথা কয়টি বলিল।

"ওঃ আর শুনতে চাস্‌না, তবে আর ব'লব' না" বলিয়াই সুরেন, কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল "কিন্তু বলি কা'কে বোন্?" বলিয়াই মাথার রুক্ষ চুলগুলা ধরিয়া টানিতে টানিতে আপনিই বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি তাই ভাবিরে; যে যদি সে এখনও বেঁচেই থাকে ত' কি দুঃখটাই না সে পাচ্ছে।"

"আমাদের কপাল তত ভাল নয় দাদা, সে বেঁচে নাই, থাক্‌লে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌ত', কতদিন আর রাগ ক'রে থাক্‌বে।"

"রাগ ত' সে ক'র্ত্তেই পারে বোন্‌, কিন্তু ফিরে কি ক'রে সে আস্‌বে, সমাজ যে তাকে একদণ্ডও বাড়ীতে থাক্‌তে দেবে না, এটা ত' সে খুব ভালই জানে, আর আমার কাছেই যদি জায়গা না পায় ত' বাপের বাড়ী যাবার মেয়েই সে নয়।"

উষার উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল কারণ এই কথাগুলা কহিয়া কহিয়া তাহার দাদার প্রাণের পুরাতন বেদনাগুলি জাগাইয়া তুলিতে সে নিতান্তই নারাজ। কিন্তু এতক্ষণে একটা বলিবার মত

কথা পাইয়া আবার বসিয়া বলিল, "সমাজ নেবে না, কিন্তু তুমি ত দাদা, সমাজের অনেক উঁচুতে, তুমি যে মহেশ্বরের মত দেবতা'দের সুমুখে আদর্শ ধ'রে তুলে'ছ'। সুরেন সে কথাটা যেন না শুনিয়াই বলিতে লাগিল "দেখ্ উষা, আমি তা'র মধ্যে একটা বেশ মজা দেখেছিলাম—যে সে কিছুতেই কারুর কাছে ঘাড় হেঁট ক'র্ব্বে না, অথচ আমি যে তা'র হ'য়ে কাকেও একটা কথা ব'লব', তাও ব'লতে দেবে না। তা'র ঐ দৌর্ব্বল্যটাই আমি আগাগোড়া দেখে এসেছি, তাই আজ এত সহজেই বুঝতে পাচ্ছি যে সে বোধ হয় নিজে কষ্ট পেয়ে অনাহারে ম'চ্ছে, তবু যে তা'র দুঃখের ভাগ আমি একটু নেব' সেটুকু সুখও তা'র সহ্য হবে না।"

"আমি রান্না ঘরে যাই দাদা" বলিয়া উষা উঠিয়া গেল। সুরেন সে কথা শুনিতেও পাইল না, সে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল, বোধ হয় বৃষ্টির ফোঁটা গুনিতেছিল। সেই দিকে তাকাইয়াই বলিল "আমি তাই শুধু ভাবিরে, যদি সে আমার উপর সমস্ত দুঃখ চাপিয়ে দিয়ে চ'লেই গিয়ে থাকে ত' এত দুঃখের ভারেও ত' কৈ আমি ভেঙ্গে পড়ছি না।" বলিয়া তেমনই ভাবেই মেঘের দিকে চাহিয়া রহিল, কতক্ষণ, সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ কে "সুরেন" বলিয়া ডাকিতেই তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ী উঠিয়া দেখিল পেছনে মাসীমা।

৮

"সুরেন, তোর বাড়ীতে আজ আমি অতিথি হ'লাম।"

সুরেনের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে তাড়াতাড়ী গিয়া মাসীমার পায়ের ধূলা লইল। মাসীমা তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "একেবারে ভুলে রইলি বাবা, একটা খবরও নিস্ না যে, বুড়ী বেঁচে রইলো কি ম'রে গেল।"

"সে কিগো, এই যে তোমাকে উপরোউপরি দু'খানা চিঠি দিয়েছি তা' তুমি বুঝি একখানাও পাও নাই? যে তোমাদের দেশের পিয়ন? আমি সব বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি দাঁড়াও না?"

এই সময় উষা আসিয়া দাঁড়াইল,—বলিল "পিয়নের দোষ কি? পিয়ন ব্যাটাদের ত' জব্দ ক'র্ব্বে তোমাকে জব্দ ক'র্ব্বার লোক নেই ব'লে বুঝি? তুমি সে চিঠির একখানাও কি ডাকে দিয়েছ'?"

"সে কিরে উষা, ডাকেই দেওয়া হয়নি? কৈ তুই ত' আমায় বলিস্নি?"

"তা আমি কি ক'রে জান্ব' যে তুমি অন্য চিঠি লিখেছ' কি না? দুখানাই ত' প'ড়ে র'য়েছে, একখানার আবার ঠিকানাও লেখা হয় নি। তুমি দেখ্বে মাসীমা?" বলিয়াই উষা তাঁহার চরণে প্রণতা হইল। মাসীমা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে

কোলের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মেয়েটি কে?"
স্থরেন

একটীবার মাত্র দর্শনে মানুষকে এত আপনার করিয়া লইতে পারে যেন বহুদিনের পরিচিত, কতকালের আপনার লোকের মত হাসিয়া নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতে পারে, তাহাকে আর কেহ না বুঝুক্ স্থরেনের মাসীমার বুঝিতে বাকী রহিল না তবে তিনি একটু ভুল করিয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে সে কোন অনাথা বিধবা আশ্রয় নাই, তাই আশ্রয় খুঁজিতে আসিয়া একটা ভালই আশ্রয় পাইয়া গিয়াছে। সে যে মল্লিকার মত নিজের সৌরভে বনকে আকুলিত করিয়া দিয়াছে, তাই তাহার সান্নিধ্যটা ত্যাগ করিতে স্থরেন কিছুতেই পারে নাই। ক্ষতের মুখে এমনধারা স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া চোখের উপর জ্যোৎস্নার আলোটা ধরিয়া রাখিয়া রাহুগ্রস্ত চাঁদের স্মৃতিটা ভুলাইতে ত' সে ছাড়া আর কেহই পারিত না, তাই স্থরেন মাসীমার আশ্রয় লয় নাই। বড় শ্রান্ত হইয়াছিল সে, তাই একটা শুক্নো তালগাছের তলায় আশ্রয় না লইয়া, শ্যামল-চন্দন-তরুর আশ্রয় লইয়া তাপক্লিষ্ট জীবনটাকে শীতল করিয়া লইতেছিল পথহারা হইয়াছিল সে, তাই পথ খুঁজিতে খুঁজিতে একটা একই পথের পথিককে খুঁজিয়া পাইয়া স্থরেন তাঁহাকে পত্র দিবার অবকাশ পায় নাই। সে যে নিজের চিন্তাতে এতটা উদ্বিগ্ন ছিল, তাহাতে তাঁহার দুঃখ হইল না,

বরং সে যে দুঃখের আতিশয্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই এই কথা ভাবিয়া মাসীমা সন্তুষ্টই হইলেন, যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃখের অর্দ্ধকখানি তাঁহার বুক হইতে নামিয়া গেল। উষা ইতিপূর্ব্বেই একখানি আসন আনিয়া দিয়াছিল তাহাতে বসিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মেয়েটী কে রে সুরেন ?"

"ভগবান একটি বোন জুটিয়ে দিয়েছেন মাসীমা, একটা ক'র্ব্বার মত কাজ ক'র্ব্বার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছিলাম, তাই ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। তুমি এলে মাসীমা! ভালই হ'য়েছে, আমি ওকে ছেড়ে এক পা'ও ন'ড়তে পারি না, আমি এবার দিনকতক বেড়াতে যাব" ; একসঙ্গে থাকাটা যে বেশ ভাল দেখায় না, মাসীমা এটাও বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই সুরেনের যাওয়াতে কোন আপত্তি না করিয়া বলিলেন "তা' যাও তা'তে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমাকে একটী কথা দিয়ে যাও।"

"কি কথা মাসীমা ?"

"এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে প'ড়ে আমাকে বড় ধ'রেছিল, আমি তা'কে কথা দিয়েছি।"

"তা' বেশত' ? কার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও ?"

"কার সঙ্গে আর পাগল ছেলে ? বাড়ীটা কি অমনই খালি প'ড়ে থাকবে ? আমি ঘরের লক্ষ্মী আনব' না।"

সুরেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মাসীমা ! পাগল

আমি হইনি পাগল হ'য়েছ' তুমি। ঘরের লক্ষ্মী চ'লে গেছে মাসীমা, আর লক্ষ্মীছাড়ার হাতে একটা দুধের মেয়ে তুলে দিও না। লক্ষ্মীর পদরজেঃ পদ্ম আর আমার ঘরে ফুট্‌বে না।"

"তাহ'লে আমি কোথায় যাই সুরেন? বুড়ো বয়সে কি চিরদিন খেটে খেটেই ম'র্ব্ব।"

"কেন মাসীমা? এই যে উষা র'য়েছে ওর চেয়ে ভাল ক'রে সেবা ক'র্ত্তে কেউ পার্ব্বে না।" তাহার পরই কি ভাবিয়া বলিল "আর ওর বাপের বাড়ী থেকে যদি ওকে নিয়েই যায় তাহ'লে তুমি এখানে থাক্‌বে আমি তোমার সেবা ক'র্ব্ব।"

"বাপ পিতা মো'র ভিটে কি শুন্য রাখা ভাল বাবা? না না সে হবে না আমি কথা দিয়েছি, ফেরাতে পার্ব্ব না।"

উষা সেই সময় উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "হাঁ মাসীমা, তুমি বিয়ের ঠিক কর, আমি একলাটা থাক্‌তে পারি না, দাদা! এ বিয়ে ক'র্ত্তেই হবে" সুরেন উষার কথাটা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। এই মেয়েটার সঙ্গে এসব কথা আজ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই, আর এত তরলভাবে কথা কহিতেও তাহাকে সে কখনও দেখে নাই। আঘাত পাইয়া উষার চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন রকমের হইয়া গিয়াছিল, এতদিন সে সুরেনের দুঃখে সহানুভূতি করিয়া আসিয়াছে;—সে যে পুরুষ, আর একটা বিবাহ করিলেই পারে উষা সে কথাটা একবার ভাবেও নাই বলিয়া বোধ হয়। সে

সুরেনকে একটা নূতন আদর্শের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই নূতন ভাবটা দেখিয়া সুরেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে একটু অনুযোগের স্বরেই বলিল "কিন্তু সবদিক ভেবে দেখেছ মাসীমা ?"

"সবদিক ভেবে দেখেছি সুরেন। আমি তোর চেয়ে কম ভাবি না। এখন যা' বিশ্বেশ্বরকে একটা প্রণাম ক'রে আয়। শুভকার্য্যে আর বাধা দিস্ না বাবা!" বলিয়াই তিনি উষাকে ডাকিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

১০

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিশ্বেশ্বরের চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেই সুরেনের চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া গেল. সে ভাবের আবেশেই বলিয়া উঠিল "এখন ব'লে দাও প্রভু! আমি কোন্ পথে যাই।" সেই প্রণত অবস্থাতেই তাহার মনে হইল, সে যেন এক রাজ্য হইতে আর এক রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। এতদিন শৈল'র স্মৃতি উষার আলোকের মত তাহার শূন্যপ্রানটার ভিতর একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, অন্ধকারে বীণার ঝঙ্কারের মত একটা চির-ঝঙ্কৃত অশ্রান্ত-রাগিনী তাহার প্রাণের কানায় কানায়

পূর্ণ থাকিয়া বহির্জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে ব্যাহত করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, দেবতার স্বর্গসিংহাসনের উপর দৈত্যপুরীর প্রবল আক্রমণের মত আজ যেন শৈল'র লীলাক্ষেত্রে অন্য একজন অনধিকার প্রবেশ করিতে আসিতেছে, আর তাহাকে উৎসাহ দিতেছেন তাহার মাসীমা। প্রণামান্তে সজলনেত্রে মুখ তুলিতেই দেখিল একটা স্ত্রীলোক তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে, অদ্ধ অবগুণ্ঠনে তাহার মুখটা ঢাকা। কিন্তু সুরেন তাহার দিকে তাকাইতেই সে অবগুণ্ঠনে মুখটা ঢাকিয়া ফেলিয়া ত্রস্তপদে সঙ্গিনীদের সঙ্গে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্র তাহার গমনের ভঙ্গিমাটা দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সেখান হইতে তাহাকে আর দেখা হইল না। সুরেন্দ্রনাথের মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল; সে বুঝিতে পারিল না, যে এই দরিদ্রবেশা রমণী কে? সে যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের বেশ অবস্থাপন্ন বলিয়াই বোধ হইল; অথচ তাহাদের সঙ্গে এই দুঃখিনী কে? এই দুঃখিনী যে কে? তাহা বুঝিতে সুরেন্দ্রের মন প্রিয় ও অপ্রিয় চিন্তায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। যেন একটা চিরপরিচিত আত্মীয় পরের সঙ্গে পরের মত দূরে সরিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়াই সুরেন্দ্রনাথ মাসীমাকে ডাকিয়া বলিল "মাসীমা! বিয়ে আমি আর ক'র্ব্ব না।"

"কেন?"

পৃথিবীতে শত সহস্র কাজ ফেলে, যা'র আমি মোটেই উপযুক্ত নই, সেইটাকেই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেওয়া কেন?"

মাসীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে দাঁড়িয়ে আমি ত' মিথ্যাবাদী হ'তে পারি না বাবা! তুমি যদি না'ই কর আমাকে অন্য চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে।"

ইহার উপরে আর কথা নাই, সুরেন চুপ করিয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনাটা কি জানি কেন তাহার প্রাণে শ্রাবণের মেঘের মত ঘোর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

(৩১)

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াও যখন শৈল দেখিল যে তাহার স্বামী তাহাকে চিনিতে পারিল না, আর বাড়ীতে আসিয়া যখন স্পষ্টই শুনিল যে তাহার স্বামীর সঙ্গেই রাণীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং তিনিও তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন, তখনই সে বুঝিল যে তাঁহার অভাগিনী শৈলকে তিনি একেবারেই ভুলিয়াছেন অভিমানের একটা ক্ষুব্ধ ঝটিকা তাহার বুকের ভিতরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। নীরবে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিল, কেন যে সে আজ এত কষ্ট পাইতেছে কেন যে ঈশ্বর আজ তাহাকে এত কষ্ট দিতেছেন, আর সে জীবিত থাকিতে তাহার

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, এই সব ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বেশ্বরের উপর তাহার রাগটা যেন বাড়িয়া গেল। যেন এটা তাঁহারই দোষ যে তাঁহার রাজ্যে আসিয়াও মানুষের উপর এত অবিচার হয়। দুঃখে সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন যাহা হোক করিতেই হইবে, রজনী শেষ হইবার পূর্ব্বেই শৈল তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রামের যে শ্মশান স্তূপ বিরাটকায় জঙ্গলের মূর্ত্তিতে আজও পথিকের মনে বাংলার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়, সে দিকটায় তখনও রেল হয় নাই, হুগলি জেলার ওদিকটার লোকেদের তখন সাত আট ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া কিম্বা নৌকা করিয়া গঙ্গাপার হইয়া আসিয়া গাড়ী ধরিতে হইত। রাণীর পিতা পীতাম্বর বাবুকে নৌকা করিয়া হুগলিতে আসিয়া গাড়ী ধরিতে হইল। নৌকা যখন হুগলির ঘাটে দাঁড়াইল তখন বেলা প্রায় দুপুর। তখন গাড়ী নাই, অগত্যা খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইল। ঘাটে নৌকা বাধিয়া তাঁহারা রন্ধনের আয়োজন করিলেন।

৩৩

শৈল যখন সংসারবিচ্যুত পথিকের মত প্রাণের যাতনায় পাগলের মত হইয়া হুগলিতে দিন কাটাইতেছিল, সেই সময়ই সে একদিন গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দেখিল, একখানা নৌকার আরোহীরা রন্ধনের আয়োজন করিতেছে সে পাগলের মত গঙ্গাতীরে বসিয়া সেই নৌকার পানে তাকাইয়া রহিল। একটা সংসার দেখিয়া তাহার সংসারের কথা মনে পড়িয়া যাইতেই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। পাছে আরোহীদের চোখে পড়িয়া যায় এই ভয়ে নৌকা হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়া নৌকার দিকে পিছন ফিরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, সে অশ্রুজলে যে কত ব্যথা, কত মনস্তাপ, কতখানি আবেগ লুক্কায়িত ছিল তাহা শৈল'র চেয়ে বেশী কেহই জানিত না। সে যে কতখানি আত্মগ্লানি বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া আজ পাগলের মত, ভিখারীর মত পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানিতেন, এই দুঃখ এই ঘৃণা পৃথিবীর এই প্রখর দৃষ্টি আর যে সহিতে পারে না, তাই শৈল আজ পথের ভিখারীর মত পথে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে যে আজ পথের ভিখারীর চেয়ে দরিদ্র নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল হইয়াছে তাহা ত' সে প্রাণে প্রাণেই অনুভব করিতেছিল। পিছন হইতে

"কি হইয়াছে দিদি, কাঁদ্‌ছ' কেন?" বলিয়া যে তাহার গলা জড়াইয়া দিল, সে রাণী। শৈল চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। যেন এমনই একটা মিষ্ট স্বর এমনই একটা সকরুণ সম্ভাষণ, এই রকমই একটা স্নেহের দাবী সে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া চাহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোথাও পায় নাই। রাণী যখন রাণীর গৌরবে, স্নেহের রাণীর মত আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখনই যেন তাহার হঠাৎ মনে হইল তাহার দিন ফিরিল। যেন প্রতি প্রভাতে উঠিয়া সে কাহার আকুল আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিত, কিন্তু তাহার সেই নিষ্ঠুর প্রেয়ঃ কোন দিনই তাহাকে ধরা দিতে আসে নাই, আজ যেন শীতের কুজ্ঝটিকা বন্ধন শিথিল করিয়া কোকিলের কুহু নব-বসন্তের জাগরণ সূচনা করিয়া দেওয়ার মত, রাণী তাহার সেই চিরবাঞ্ছিত অথচ নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়তমের সন্ধান আনিয়া দিল; যেন কতকাল চলিয়া গিয়াছে, কত নদী গতি ফিরাইয়াছে, কত পাহাড় রেণু রেণু হইয়াছে, কত সমুদ্র মরুভূমি রচনা করিয়াছে, সে ধ্যাননিমগ্না পার্ব্বতীর মত একই বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিতেছে, কিছুতেই সে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতে চাহে নাই, আজ যেন কাহার মৃদুল হস্তস্পর্শে দৈত্যপুরীর ইন্দ্রজালের মত সহসা সে বৃক্ষ ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে সজীব হইয়া দাঁড়াইল; চন্দ্র যেন কত যুগযুগান্তর ধরিয়া

রাহুগ্রস্ত ছিল, কোন্ দেবীর চরণ ধূলিপাতে আজ অকস্মাৎ রাহুমুক্ত হইল। আনন্দের আতিশয্যে শৈল রাণীকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল "তুমি আমার বোন্ হবে?"

"হ্যাঁ দিদি, আমি তোমার ছোট বোন্, আমাকে সব কথা বল।"

শৈল হাসিল। শ্রাবণের ধারার মাঝে অন্ধকার রাত্রিতে নিবিড় জলদের বক্ষঃ হইতে প্রথম বিদ্যুৎ বিকাশের মত সে হাসি পথিককে পথ দেখায় বটে, কিন্তু তখনই আবার গাঢ়তর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। সরলা রাণী সে হাসির অর্থ বুঝিল না, একটু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "হ্যা দিদি, আমি তোমার বোন্ হ'তে পার্ব্ব' না?" শৈল আবার হাসিল, কিন্তু হাসিবার পূর্ব্বেই তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রাণীর কথা যেন সে শুনিতেই পায় নাই, এমনই করিয়াই বলিল "আমিও একদিন তোমার দিদি হ'বারই উপযুক্ত ছিলাম বোন্, আজ নিয়তি আমায় এত দূরে এত নীচে ফেলে দিয়ে গেছে"—রাণীও কাঁদিল। বলিল "দিদি ব'ল্‌বেনা?" শৈল তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "কাঁদিস্ না বোন্, তুই যখন আমার বোন্ হ'লি, তখন দিদির প্রাণের দুঃখটা বোঝবার চেষ্টা কর্, আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্চ্ছি না।"

রাণী বলিল "আচ্ছা বল' তোমার বাড়ী কোথায়?"

শৈল দুঃখে হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনই হাসি বন্ধ করিয়া বলিল "বাড়ী থাক্‌লে রাস্তায় ব'সে কাঁদি রে পাগলী?" বলিয়াই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তোকে কি ব'লে ডাক্‌ব' রে?"

"আমার নাম রাণী।"

"রাণীই বটে। তুই যা'র ঘরে যাবি, তার ঘর আলো হবে। তুই বেশ লক্ষ্মী মেয়ে রাণী।"

"হ্যাঁ তা বুঝি, আমার সইরা বলে, আমি ভারি বেহায়া।"

"তোমার আদর, তা'রা কি জানবে রাণী, আশীর্ব্বাদ করি যে বোঝবার সে যেন বোঝে" বলিয়া নৌকার দিকে তাকাইয়া বলিল, "উনি তোমার মা বুঝি, যাও রান্না হ'য়েছে বোধ হয় খাওগে।"

"না আমি খাব না।"

"খাবি না কিরে? তোর খিদে পায় নি?"

তুমি খেয়েছ?

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই আশ্চর্য্য মেয়েটা কে? যে তাহাকে একটীবার মাত্র দর্শনে এত আপনার করিয়া লইয়াছে যেন কত যুগের কত কালের পরিচিত ছোট বোনের মত তাহার উপর অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শৈল আবার বলিল "যাও ছোট বোন্‌টি আমার খাওগে।"

"তুমি খেয়েছ?"

"হাঁ আমি খেয়েছি।"

"কোথা খেলে, কাদের বাড়ীতে খেলে?"

"তোর তা'তে কি পোড়ার মুখী" বলিয়া শৈল তাহার গাল

টিপিয়া দিয়া হাসিল, কিন্তু আবার বলিতে লাগিল "তুই না শুনে ছাড়বিনা দেখছি, কিন্তু কি শুন্‌বি বোন্। আমি এখানে একটা ছোট লোকের কুঁড়েতে থাকি, আর সেইখানেই ৩টা রেঁধে খাই।"

"ছোট লোকের বাড়ী থাক? কেন দিদি?"

"আর পৃথিবীতে জায়গা নেই বোন্" বলিয়া শৈল অঞ্চলে মুখ ঢাকিল; রাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল "চল দিদি, আমাদের নৌকাতে চল, আমার সঙ্গে তুমি যদি না যাও, তাহ'লে আমিও যাব না।"

"তোরা কোথায় যাচ্ছিস্ রাণী?"

আমরা কাশী যাব', তুমিও চল'।

কাশী? বেড়াতে?

রাণী একটু হাসিল, বলিল 'না, হ্যাঁ বেড়াতে. তোমাকেও যেতে হবে।"

"আমাকে তোর বিয়ের সময় নিয়ে যাস্।"

রাণী হাসিয়া উঠিল "তাহ'লে তোমাকে এখনই যেতে হ'চ্ছে দিদি?"

শৈলও হাসিল, বলিল "ও তোর বিয়ে হবে সেখানে বুঝি?"

"হ্যাঁ তোমাকে আস্‌তেই হবে—আস্‌বে না বুঝি?"

"চল্ আমি ত' পথেরই ভিখারী, ম'রতেই যখন ব'সেছি তখন কাশীতেই মরা ভাল। কিন্তু দাঁড়া"—বলিয়া শৈল দ্রুতপদে

কুটীরে ফিরিয়া গেল, যখন ফিরিয়া আসিল তাহার চক্ষু জলে ভরা, বিদায়ের চিহ্ন যেন তাহাতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রাণী তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিয়া গিয়া নৌকাতে উঠিল।

সুরার পাত্রটা অধরে তুলিতে গিয়া যদি কেহ দেখে যে, পাত্রটা শূন্য তাহা হইলে শুধু তাহার প্রাণে আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সুরার পাত্রটাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে। যে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া দেয়, সেই রূপটাই কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, মানব চরিত্রের এই অজ্ঞেয় রহস্যটা বুঝিতে না পারিয়াই মানুষ সারাজীবন আত্মগ্লানি ভোগ করে। মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সন্তোষ যখন পলাইল, তখন জমীদার লালমোহন নিষ্ফল আক্রোশে ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছিল। সন্তোষকে একবার পাইলে সে যে তাহাকে কি করিবে সেইটা ভাবিয়াই সে স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু সময় যতই চলিয়া যাইতে লাগিল সন্তোষের উপর এই নিষ্ফল আক্রোশটা তাহার ততই বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উমার রূপটা তাহার মানসচক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা সে কোন ক্রমেই করিয়া উঠিতে পারিল

না, অথচ এইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও নিজের বিবেকের নিকট নিতান্ত হীন হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু এখানে বসিয়া থাকিলেত' কোনই উপায় হইবে না, বিশেষতঃ কালের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী লাভের আশাটা তাহার মন হইতে মুছিয়া যাইতেছিল। অগত্যা উদ্দেশ্য সফল হউক না হউক নিজের মনস্তুষ্টির জন্যই লালমোহন একবার দেশভ্রমনের অছিলায় বাহির হইয়া পড়িল। বেশী লোকজন না লইয়া দুই তিনজন মাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া লালমোহন দেশত্যাগ করিল।

বিলাসী হইলেও লালমোহনের দেহে শক্তি ছিল না এমন নহে। তাই সে যে দিন এলাহাবাদ, মথুরা , গয়া ঘুরিয়া কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন রাত্রে কি একটা প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষ্যে ঘাটে ঘাটে প্রকাণ্ড জনতা হইয়াছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে যাইতে যাইতে কে যেন তাহার পকেটে হাত দিল বুঝিতে পারিয়াই লালমোহন ক্ষিপ্রহস্তে চোরের হাতটা ধরিয়া ফেলিল। "হুজুর আপনি" বলিয়াই চোর লালমোহনের পায়ের ধূলা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল। তাহার এই অতিভক্তি দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতেই লালমোহন দেখিল, সে সন্তোষ।

রেলকোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া সন্তোষ অনেক দেশ ঘুরিয়াছিল কিন্তু কোথাও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিল না দেখিয়া

বেচারা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল "রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসম্বল হইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন" সে ইহাও নাকি শুনিয়াছিল যে বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে কেহ অভুক্ত থাকে না। হঠাৎ এই মতলবটা মাথায় খেলিয়া যাইতেই সে কাশী আসিয়া পড়িল। কাশী আসিয়া কিন্তু দেখিল বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে কেহ অভুক্ত না থাকিলেও, বাবুয়ানার সহিত থাকিতে হইলে বিশ্বেশ্বরের চরণতলে ধন্না দিলে হইবে না, কিছু কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরিশ্রম করা তাহার মোটেই অভ্যাস ছিল না, বড় লোকের মোসাহেবী করিয়া সে অনেকদিন কাটাইয়াছে, যেটুকু পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল, তাহাও জমিদার লালমোহনের সুশুভ্র তাকিয়ার উপর সে রাখিয়া আসিয়াছে। আর সেই হইতেই তাহার এই বাবুয়ানার আকাঙ্ক্ষাটা বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন সকালবেলা বাজারের সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সন্তোষ তাহার এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথাটাই ভাবিতেছিল এবং কেমন করিয়া তাহার প্রতিপত্তিটা অক্ষুণ্ণ রাখিবে সেই কথাটাই মনের ভিতর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করিয়া কল্পনায় তাহার একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটী বাবু, পরণে তাহার দেশী ধুতি কিন্তু কোঁচান' নয়, গায়ে পাঞ্জাবী কিন্তু বুকের বোতাম খোলা, পায়ে ভাল চটী-জুতা, বাজারে যাইতেছেন;

তাহার পকেট হইতে একখানা ভাল সিল্কের রুমাল অর্দ্ধেকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সন্তোষের মনে হইল ঐ রকম একখানি সিল্কের রুমাল তাহার যদি থাকিত? "কিন্তু যদি থাকিত কেন?" মনে হইতেই, বাকীটুকু মনে করিবার পূর্ব্বেই সন্তোষ গিয়া সেটি তাহার পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়াই তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া সরিয়া আসিল। কিন্তু রুমালে যে পাঁচটা টাকা বাঁধা ছিল, সেই টাকাই তাহাকে অর্থোপার্জ্জনের সুগম পথ দেখাইয়া দিল। এত সহজে টাকা উপায় হয় দেখিয়া সন্তোষ একটু আশ্বস্ত হইল। যদিও সে দুই একবার বেশ উত্তম মধ্যম শিক্ষা পাইয়াছিল তবু "পেটে খেলে পিঠে সয়।" তা'ছাড়া তাহার অন্য উপায়ও ছিল না, সন্তোষ অকূলে তরী পাইল। কিন্তু সেদিন যখন সে লালমোহনের হাতে পড়িল, সেদিন তাহার অন্তরাত্মা শত ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই লোকটার পথ হইতে এতদূরে সরিয়া থাকিয়াও যে সে আজ এত অসম্ভাবিতরূপে তাহার হাতে পড়িয়া যাইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু যে লোকটীকে সে এতদিন ধরিয়া চিনিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার কাছে সে সহজে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। তাই পায়ের ধুলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া বলিল "হুজুর মেয়ে মানুষ হাতছাড়া ক'রে ফেলেছি, তাই হুজুরের সাক্ষাতে যেতে সাহস করি নাই, কিন্তু এতদিনে তা'র একটা হিল্লে হবে ব'লে বোধ হয়।"

লালমোহন বলিল "কি রকম ?"

"হুজুর! পাছে লোক জানাজানি হ'লে আপনি বিপদে পড়েন এই ভেবে আপনার বাড়ীতে না নিয়ে গিয়ে ক'ল্কেতা নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু গুণ্ডাতে আমাকে তাড়িয়েছিল, আমিও ভয়ে আপনার কাছে যেতে পারিনি, কিন্তু সে যে এখানে এসেছে তা' আমি দিব্য ক'রে ব'ল্তে পারি, আর হুজুরের সাহায্য পেলে তা'র ঠিকানাটাও খুঁজে বের ক'র্ত্তে পারি।"

"আচ্ছা চল' আমার বাসায়, কিন্তু কথার খেলাপ হ'লে জেলে যেতে হবে মনে থাকে যেন।" সকলে বাসায় ফিরিল।

সন্তোষ উপস্থিত নিশ্চিন্ত হইল: সে সত্যসত্যই উষাকে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়াছিল।

(৩৫)

সেদিন দেওয়ালী, আলোকমালায় সমস্ত বারাণসী সুসজ্জিত হইয়াছিল, উষাদের বাড়ী হইতে কেহ কেন আসিল না অনেক দিন ত' তাহাদিগকে খবর দেওয়া হইয়াছে এই ভাবনাটা প্রবল হইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাই সুরেন সেদিন সন্ধ্যার পরই গঙ্গার ধারে গিয়া বসিয়াছিল। সমস্ত বারাণসী আলোকমালায় ভূষিতা হইয়া বিবাহসভায় গমনোন্মুখী অলঙ্কৃতা কুমারীর মতই শোভা পাইতেছিল। জাহ্নবীর শান্ত বক্ষে তীরস্থ অট্টালিকার আলোকময় প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই চিরনিদ্রিতা, অথচ সুবর্ণ কাঠীস্পর্শে জাগরিতা রাজকুমারীর নদীর নিম্নের অট্টালিকার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল; কিম্বা মহীরাবণের পাতালের রাজ্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া রক্ষঃ নন্দনের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। শান্ত নদীতীরে এই শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া অতিশ্রান্ত সুরেন্দ্রনাথ নিমেষের জন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। এমন সময় কে যেন তাহার পাশ দিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে "কালীগঞ্জ সহরটাও এমনই সুন্দর, সাজালে বেশ মানায়।" কালীগঞ্জ নাম শুনিতেই সুরেনের চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিল। নিকটে আসিতেই

সুরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল "ম'শায়দের বাড়ী কি যশোর জেলায়?" কালীগঞ্জের লোক দুইটী একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে যে কথা কহিল, সে লালমোহন।

লালমোহন বলিল, "কালীগঞ্জে বাড়ী নয় বটে, তবে কালীগঞ্জ আমরা খুব চিনি—মহাশয়ের কি প্রয়োজন শুনতে পেলে, মহাশয়ের কিছু সাহায্যও ক'র্ত্তে পারি।"

"কালীগঞ্জের জমীদারদের আপনি চেনেন?"

"খুব চিনি, তাঁরা আমাদের একরকম আত্মীয় ব'ল্লেও হও।"

"তাঁদের একটী মেয়ে বিপদে প'ড়ে আমার কাছে আছে—তাঁদের টেলিগ্রাফ ক'রেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর পাই নাই।"

"ও তা' আমরা দুই একদিনের মধ্যেই বাড়ী যাব' ইচ্ছা করেন, আমাদের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেবেন। আমরা পৌঁছে দিবে যাব'। আপনি অতি মহাশয় লোক আপনি তাকে রক্ষা ক'রে এসেছেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বিশেষ আপ্যায়িত হ'লাম।"

"অতি সামান্য লোক ম'শায়—তা' যা'হ'ক্ করা যাবে।" বলিয়া সুরেন উঠিয়া পড়িল। বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের লইয়া বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিল। তাহারাও

সে রাত্রির মত বিদায় চাহিল—সুরেনও বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু বহুদিনের এই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটাকে এত হাতের কাছে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া লালমোহন আবার সেই পরিচিত স্বরে ডাকিয়া উঠিল, "সন্তোষ।"

১৬

রাণীর মা শৈলকে নিজের মেয়ের মতনই দেখিতেন—তাঁহার সংসারের প্রত্যেক কাজেই ইচ্ছা করিয়াই সাহায্য লইতেন, আর পীতাম্বর বাবু দুবেলা খাইবার সময় শৈলকে কাছে বসাইতেন ; সে না হইলে তাঁহার খাওয়াই হইত না। কোন দিন কোন অছিলায় শৈল নিকটে না থাকিলে "আমার মা কৈ গো ?" বলিয়া এতই ডাকিতেন, যে শৈলকে সহস্র কার্য্য ফেলিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে বসিতে হইত। শৈল'র স্নেহ-পিপাসু হৃদয়টা যাহা দিন দিন মরুভূমির মত শুকাইয়া তাহার মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী করিতেছিল, এই সংসারে আসিয়া তাহা জনকজননীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া তাহাকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইল।

জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলাকে চাপা দিয়া এই নূতন স্রোতটায় গা ঢালিয়া শৈল'র জীবন এক রকম ভালই কাটিতেছিল। নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে পরের সুখে সুখী করিয়া লইয়া, পরের হাসির সঙ্গে হাসি মিশাইয়া জীবনের নীরস দিনগুলা, প্রভাত হইলেই সন্ধ্যার অপেক্ষায় আকাশের পানে তাকাইয়া থাকা আবার সন্ধ্যা হইলেই প্রভাতের পথপানে চাহিয়া থাকা অপেক্ষা একরকম সুখেই কাটিতেছিল। কিন্তু তাহার বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া পড়িল, বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল—তাহাকে যাইতেই হইবে। শৈল ভাবিল, "আমাকে রাস্তায় মরিতেই হইবে—লোকালয়ে মুখ গুঁজিয়া যে চরম বিশ্রামের অপেক্ষা করিব—সে সুযোগ ভগবান আমায় দেবেন না। নিশ্চয়ইত'; যে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পথের আশ্রয় লইয়াছিল—তাহারত' পথেই মরা উচিত।" শৈল যে সে বাড়ীতে থাকিতে পারে না—সে থাকিলে যে তাহার স্বামীর ঘর-করার সাধ চূর্ণ হইয়া যাইবে—কত বেদনা কত দুঃখই না তিনি পাইয়াছেন, আজ আর তাহার সাধে সে বাদ সাধিবে না। তাহার অস্তিত্ব জগতের চোখে লুপ্ত হইয়াছে সেই ভাল। তিনি যে তাহাকে ভুলিয়া আবার বিবাহ করিয়া সংসার বাঁধিতে পারিবেন, সে আশাই সে করে নাই—ভগবান যখন তাঁকে দুঃখের জ্বালা দূর করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন, সেই তাহার আশার অতীত। তাহার

জন্য যে তাহার স্বামীর সংসার ভাঙ্গিয়া গেল না, এ তাহার অনেক পুণ্যের জোর বলিয়াই সে মনে করিল। আর তাঁহারই পায়ে মতি রাখিয়া তাঁহার সুখের স্মরণে সুখী হইয়া সে মরিবে. 'তা' যদি রাস্তাতেই হয় হোক্; কিন্তু এমনই করিয়াই তাহার জীবনের অবসান হইবে ভাবিয়া, এমনি করিয়া আশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইয়া কত দুঃখীর দুয়ারে গিয়া যে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইবে, কত যুগ ধরিয়া যে তাহাকে আশার প্রদীপ স্কন্ধে করিয়া নিরাশার অন্ধকারে মাথা কুটিতে হইবে, কতকাল কতকাল পরে যে তাহার এই উৎসবগীতি-শূন্য দুর্ব্বহ জীবন যজ্ঞে শেষ আহুতি দেওয়া হইবে, আর যমদূত আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া কোন্ পূতিগন্ধময় নরকে নিক্ষেপ করিবে, এই সব কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই কতগুলা উষ্ণশ্বাস যে তাহার রক্তাক্ত বক্ষঃপঞ্জরে গিয়া প্রতিহত হইল, কত অশ্রু যে চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়াই বক্ষে মুখ লুকাইল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানিলেন। শৈল একবার ভাবিল, "স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাই, সমস্ত অনুতাপ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া অশ্রুজলে আত্মার নূতন অভিষেক করিয়া লই, তিনি স্বামী তাঁর উপর আবার রাগ কি? তিনিই দূর করিয়া দিয়াছেন, আবার তিনিই কোলে তুলিয়া লইবেন। তাঁহার শৈল'র এত দুঃখ তিনি কখনই চোখের উপর দেখিতে পারিবেন না," কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল, "কোথায়ই বা

যাইব ? তিনি লইলেও যে সমাজ আমাকে লইবে না, আমার জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে—আর কি জানি যদি পোড়াপেটে ছেলেমেয়ে হয়, তখন যে তিনি পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারিবেন না। তিনি যখন সব ভুলিয়া আবার সংসার পাতিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যখন তাঁহার গৃহ-প্রতাড়িতা হতভাগিনী শৈলকে ভুলিয়া আর একজনকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছেন, তখন কেন আর তাঁহার পথে কণ্টক হই ? কেন রাণীর আশায় ছাই দিয়া দিই ? তিনি রাণীর হৃদয়ের রাজা হইয়া থাকুন— অভাগিনী শৈল ভাসিয়া যাক্।" কিন্তু শৈলত' জানিত না, যে কতখানি দয়া—কতখানি ক্ষমার বরণডালা লইয়া তাহাকেই বুকে তুলিয়া লইবার জন্য তাহার ব্যথিত-হৃদয় স্বামী তাহাকে অন্বেষণ করিতে প্রাণের জ্বালায় দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, আর আজ কত বেদনা ও কত অনুতাপ লইয়া সে মাসীমার কথায় সায় দিয়াছে।

তারপর সেদিন প্রভাতে যখন সানাইয়ের গীতি রাণীর বিবাহের সমাচার ঘোষণা করিয়া দিল, তখন রাণীকে ডাকিয়া শৈল বলিল, "রাণী, তোর বিয়ে দেখা আমার ভাগ্যে ঘ'টে উঠ্‌ল' না বোন্—আমার ডাক প'ড়েছে, আমায় যেতে হবে।"

"কেন দিদি ওকথা ব'ল্‌ছ'—আমি কি ক'রেছি।"

"তুমি কিছু করনি দিদি, আমার বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে

উঠেছে, তাই আমাকে যেতে হবে—নৈলে কার সাধ রাণী, যে তোকে ছেড়ে চ'লে যায় ?"

"তোমার দুটী পায়ে পড়ি দিদি, ওকথা ব'ল না, আমি তা' হ'লে কাঁদ্‌ব।" রাণীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। শৈল বলিল, "না ছিঃ কাঁদতে নাই—তুমি যে মঙ্গলের ঝাঁপি হাতে ক'রে তাঁর লক্ষ্মীর কৌটা রঞ্জিত ক'রে দিতে চ'লেছ' বোন্—আমার মত হতভাগিনীর জন্য কি তোর কান্না সাজে রাণী ? তাহ'লে যে তাঁর অমঙ্গল হবে। স্বামী বড় আদরের জিনিষরে—দেখিস্ যেন ভুলেও বুক থেকে নামাস্‌নে, আর ভারী অভিমানী তাদের জাতটা—দেখিস্ বোন্ যেন কখনও এমন ধারা কথা বলিস্‌নে— যা'তে সে মনে করে যে, তুই তা'কে কম ভালবাসিস্। যাই আমি কাজ কর্ম্ম দেখিগে" বলিয়াই দুই পদ অগ্রসর হইয়া চক্ষের জলটুকু মুছিয়া ফেলিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা রাণী, আমি যদি তোর সতীন হ'তাম তাহ'লে তুই আমাকে এমনই ক'রে ভালবাস্‌তে পার্ত্তিস ?" বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

রাণীও এবার হাসিল। বলিল, "সত্যি ব'ল্‌ছি দিদি, তোমার বিয়ে না হ'লে আমরা একজনের গলায় দুজনেই মালা দিতাম।"

"মেয়েরা তাহ'লে তোকে ভারী বোকা ব'ল্‌ত।" বলিয়া শৈল চলিয়া গেল।

সুরেনের সঙ্গে লালমোহন বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল, মাঝে মাঝে সে সুরেনকে নিমন্ত্রণ করিত এবং তাহাকে লইয়া বেড়াইয়া আমোদ করিয়া পরিচয়ের প্রথম বাধাটা কাটাইয়া বন্ধুত্বটা বেশ জমকাল করিয়া লইয়াছিল। সুরেন ভাল মানুষ—তা' ছাড়া এই অবস্থা বিপর্য্যয়টা তাহাকে একেবারে নিরীহ করিয়া দিয়া গিয়াছিল, প্রকাণ্ড ঝড়ে গাছকে শুইয়ে দেওয়ার মত। সে নিজের ভিতরকার দুঃখটা ছাড়া আর সব বিষয়েই লালমোহনের সঙ্গে মিশিত। সমস্ত দিনই সে লালমোহনের কাছে কাছেই থাকিত। সন্ধ্যার পর যখন সে বাড়ী ফিরিত—তখন তেমনই গম্ভীর, দুঃখের ভারে, ফল ভরে নত বৃক্ষের মতই নম্র। তাহার যে সম্মুখেই বিবাহ একথাটা আদৌ তাহার মনে হইত না—যখনই হইত, বর্ষার আকাশের মত তাহার মনটা তখনই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত—আর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাসে তাহার বুকের আধখানা শক্তি যেন বাহির হইয়া যাইত। এমনই একটা উদাসীন লোকের হাত থেকে উষাকে বাহির করিয়া লওয়া লালমোহন একটা অতি সামান্য কাজ মনে করিল—বস্তুতঃ ধর্ম্ম না রক্ষা করিলে উষাকে কাড়িয়া লইয়া যাওয়া মোটেই আয়াস-সাধ্য ছিল না।

৩৭

সেদিন মেঘটা সমস্তদিন জল ঢালিয়াও যখন নিশ্চিন্ত হইল না, সন্ধ্যার পর হইতে দমকা বাতাস দিয়া মানুষের অন্তর কাঁপাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল, সেইদিন সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া জমাদার লালমোহন সুরেনকে অতিরিক্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। মাসীমা বাড়ী ছিলেন না, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সকালেই দুর্গাবাড়ী গিয়াছেন, আসিতেও রাত্রি হইবে; সুরেনের যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অভদ্রতা হইবে মনে করিয়া বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। শীঘ্র আসিবে বলিয়া সুরেন বাহির হইয়া গেল। একাকিনী ঊষা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া ঘরে বসিল। সুরেন বাহির হইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টিটা আবার জোর করিয়া নামিল; ঊষার একলা থাকিতে ভয় করিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই, ঘরের মেঝেতে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য্য এই দাদার চরিত্র; নিজের কথা সবই ব'লেছে, কিন্তু একটা দিন আমার কথা ভুলেও জিজ্ঞাসা করে না, আমি কেমন ক'রে এমন বিপদে প'ড়ে ছিলাম। নিজের দুঃখের ভারে সদাই নম্র; নারায়ণের মত সমস্ত যাতনাটাই বুক পাতিয়া সহ্য করিতেছে, কথনও তাহার জন্য পরকে দোষী

মনে করে নাই. কখনও সংসারকে দুঃখ দেবার চেষ্টাও তার নাই। সংসারের দেওয়া সহস্র যাতনা হাসি মুখে সহ্য করিতেছে, ঠিক যেন একটা দুঃখের খনি, দুঃখকে উপহাস করিয়া পৃথিবীতে হাসি বিলাইতেছে, আর পরের দুঃখ মুছিয়া লইয়া নিজের বুকে পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতেছে। এমন মানুষকেও তুমি কষ্ট দাও বিশ্বেশ্বর!" ভাবিতে ভাবিতে উষার চোখে জল আসিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া, বৃষ্টির জল ঘরে আসিতেছিল বলিয়া জানালাটা বন্ধ করিতে গিয়া শুনিতে পাইল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতেছে। দাদা আসিয়াছে মনে করিয়া উষা উপর হইতে দড়ি টানিয়া তাড়াতাড়ী খিল খুলিয়া দিল। দ্রুতপদে একজন উপরে উঠিয়া আসিল, অন্ধকারে উষা তাহাকে চিনিতে পারিল না, তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ী ঘরে ঢুকিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। লোকটা উপরে আসিয়াই বলিল, "আপনার দাদা হঠাৎ মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছেন, আপনাকে দেখ্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ ক'র্চ্ছেন, আপনি শীঘ্র আসুন আমি গাড়ী এনেছি।" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার মুখের উপর আলো পড়িতেই উষা চিনিতে পারিল, এ সেই লোক যাহাকে বহুদিন পূর্ব্বে তাহাদের বাগানে অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, দেখিয়াই উষার প্রাণের ভিতরটা হিমালয় পাহাড়ের হাওয়া লাগার মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সে

উর্দ্ধে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দরজাটা বন্ধ করিতেও ভুলিয়া গিয়া তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহাকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লালমোহন একটু হাসিয়া বলিল, "ঊষা আমার চেয়ে কি তোমায় কেউ বেশী সুখে রাখবে?" 'ঊষা' বলিয়া ডাকিতেই ঊষার চেতনা হইল। লালমোহনের উদ্দেশ্য সে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু যশোর হইতে এত দূরে লুকাইয়া আছে, তবু কেমন করিয়া সে যে এ পর্য্যন্ত তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছে তাই ভাবিয়াই সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছিল; লালমোহনের এই কথাগুলা তাহার কানে এমন বজ্রধ্বনি করিল, যেন তাহার কানে তালা ধরিয়া গেল। ঊষার মনে পড়িয়া গেল, অসহায়া জনক নন্দিনীকে নির্জ্জনে পাইয়া রাক্ষস রাবণ বুঝি এমনই করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল—

"সমুদ্রস্য পরপারে লঙ্কানাম মহাপুরী"

মনে পড়িল পতিপরিত্যক্তা সীতাকে এমনই অসহায় পাইয়া দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছিল, বাল্মীকির সুললিত কবিতা যে এমন কঠোর সত্যরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, দুঃখিনী জনক-নন্দিনীর মত যে আজ তাহারও ভাগ্যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছে, এই ভাবিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু এখন যে দৃঢ় হওয়া দরকার। সে ঘরের দরোজাটা বন্ধ

করিতে করিতে এমন অস্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিল "কে তুমি শীগগীর বেরিয়ে যাও নৈলে আমি চীৎকার ক'র্ব্ব" যে সে নিজে ভাল শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বাড়ীখানি তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিশাচ লালমোহনও সেই স্বরে চমকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু উষা দরজা বন্ধ করিয়া দেয় দেখিয়া দরজা ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল "উষা, অনেক কষ্ট পেয়েছি, এইবার আমার হও বিনিময়ে আমার প্রাণ নাও" "এই নও" বলিয়াই একজন বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া লালমোহনের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিল। লালমোহনের দেহেও শক্তির অভাব ছিল না, দুজনে খুব যুদ্ধ বাধিল। উষা নির্ব্বাক হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে-ছিল ভয় উত্তেজনা ও অবসাদ তাহার মনের ভিতর সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিল। এমন সময় সুরেন নীচে হইতে ডাকিল "উষা কি হয়েছে রে?" সুরেনের স্বর শুনিয়া উষা যেন স্বর্গহাতে পাইল ছুটিয়া জানালার কাছে যাইয়া সে বলিল "দাদা দাদা! এস' বড় বিপদ।"

৩৮

গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া আসিয়া শৈল যখন অসি ও জাহ্নবীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। পাহাড় হইতে ঢল নামিয়া নদীর দুই কূল শুভ্রস্রোতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, সেদিন সমস্তদিন জল হইয়াছিল, রাত্রেও মাঝে একবার জলটা বেশ হইয়া গিয়াছিল। মেঘ তখনও আকাশের গায়ে জড়াইয়া ছিল; তবে তাহারই একটু ফাঁক দিয়া চন্দ্ররশ্মি পৃথিবীতে ছায়ালোকের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল সেই রমনীয় ছায়া ধূসরিত চন্দ্রালোক দূরপ্লাবিণী জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে পড়িয়া শারদ সপ্তমী-ঊষায় ভগবতী পার্ব্বতীর আগমনের জন্যই যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত একটা ছায়াপথ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার মত একটা দেব-বাঞ্ছিত আলোকের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। মৃত্যুকে এত সুন্দর সাজে সজ্জিত দেখিয়া হতাশ হইয়া শৈল একটী গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। বৃক্ষপত্র হইতে ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া বৃষ্টির জল তখনও তাহার গায়ে পড়িতেছিল। সে যে বার বার মরিবার চেষ্টা করিয়াও কেন মরিতে পারে না, কি সুখে ঈশ্বর তাহাকে বাঁচিবার ইচ্ছা দেন, সেইটাই সে বুঝিতে পারিল না। জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলা, এই মরিবার পূর্ব্বেই কেন

এত বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাই ভাবিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, আর মনে মনে বলিতে লাগিল "ওরে হতভাগী পৃথিবীতে যা' সবচেয়ে সুন্দর—যা'র সৌন্দর্য্য মরণে হ্রাস হয় না, বরং অধিক হ'য়ে ওঠে, যে রূপ বিরহে প্রাণের অন্ধকারে চাঁদের আলো জ্বেলে দেয়—তাই যখন ছেড়ে আস্‌তে পার্‌লি, তখন এই পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে তোর এত কষ্ট কেন? যা'র সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ নেই, চোখ বুজলেই যা'র সঙ্গে সম্বন্ধ মিটে গেল, সেই পৃথিবীই তোর চোখে এত সুন্দর লাগ্‌ল'—তা' যদি না হবে, তবে তোকে আজ গাছের তলায় ব'সে কাঁদতে হবে কেন?" শৈল কাঁদিল, এ কান্নার শেষ নাই, সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। আজ সে নিশ্চয়ই মরিবে; হতভাগিনীর সারা জীবনের সমস্ত প্রিয় স্মৃতি আজ এক সঙ্গে ছায়াবাজীর মত তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল বাপ মায়ের আদরের মেয়ে সে, কত যত্নে, কত আদরে সে লালিত হইয়াছিল; তা'র পর তাহার বিবাহ, কত না আমোদ, কত না আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনের সঙ্গে তাহার বাপ-মা তাহাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন, নারী জীবনের সেই প্রথম সুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রেম তাহাকে কতই না আনন্দে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল, স্বামীর বক্ষঃ-স্পন্দন প্রথম যেদিন বক্ষে অনুভব করিয়াছিল, সেদিন আশা ও আনন্দ তাহার প্রাণে কতই না সুখ-স্বপ্নের সৃষ্টি

করিয়াছিল, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মরিবার সাধ তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া কত বারই না চক্ষে আনন্দাশ্রুর অভিষেক করিয়া দিয়াছিল। আবেগ-কম্পিত জীবনে স্বামী-প্রেম বিহ্বলা বালিকা শৈল'র বুকখানি কতবারই না নারী গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আর আজ ভাগ্যবিবর্ত্তনের সঙ্গে একটা যুগপরি-বর্ত্তনের মত কতই না দুঃখের বাত্যা সাহারার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার সুকুমার বক্ষের কত স্থানই না পুড়াইয়া দিয়াছে আর সর্ব্বশেষে আত্মহত্যা সেই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা টানিয়া দিতে আসিয়াছে। শৈল'র স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া মরা হইল না দেখিয়া স্বামীর উপরেই তাহার অভিমান হইল। কৈ? তিনিত' একবার খোঁজও লইলেন না? কিন্তু সবসাধ ছাপাইয়া একটা সাধ তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল. যে, এই পূর্ণিমা রজনীতে মরিবার পূর্ব্বে সে যদি তাহার স্বামীর সঙ্গে একটু বেড়াইয়া দু'টা কথা কহিতে পাইত তা'রপর তিনি যদি পদাঘাতে জলে ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলেও সে মৃত্যুকে সে স্মরণীয় মৃত্যু বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ভাবিবারও সময় ছিল না। "ব্যোম হর হর বিশ্বেশ্বর" শব্দে বারাণসী জাগিয়া উঠিয়া এই কঠোর সত্য প্রচার করিয়া দিল "আর সময় নাই আর সময় নাই।" শৈল ছুটিয়া জলের ধারে গেল। "মা জাহ্নবী কোল দে মা!" বলিয়া ঝাঁপ দিতে গেল।

কিন্তু ঝাঁপ দেওয়া তাহার হইল না। তাহার মন তাহাকে বলিয়া দিল, অতৃপ্ত সাধ লইয়া মায়ের কোলে স্থান পাইবে না। শৈল ফিরিল, ভাবিল মরণ ত' হাতেই আছে, কতদিন কাছছাড়া হ'য়েছি আমার স্বামী দেখ্‌তে কেমন হ'য়েছেন, তা' দেখেই ম'র্ব্ব। একবার না দেখে ম'রেও যে সুখ নেই।"

১৯

সুরেনের টেলিগ্রাম পাইয়াই উমার ভাই প্রভাত যাত্রা করিয়াছিল; কিন্তু সুরেন তাড়াতাড়িতে কাশীর ঠিকানা না দিয়া টেলিগ্রামে এলাহাবাদের ঠিকানা দিয়াছিল। তাই প্রভাত বরাবর এলাহাবাদ গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া কাহাকেও না দেখিয়া কাহারও ছলনা মনে করিয়া নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এতদূর আসিয়া একটু খোঁজ না করিয়া যাইতে পারে না, তাই এলাহাবাদেই প্রভাতের আট দশ দিন দেরী হইয়া পড়িল, তারপর নানাস্থান ঘুরিয়া সেদিন সন্ধ্যার পর যখন কাশী ষ্টেশনে নামিল তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফরমের নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই একজন টিকিট কলেক্‌টার তাহারই এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, বন্ধুটী সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কিহে প্রভাত কবে এলে? ভালত? আরে

তোমাদের দেশের একবেটা জমীদার এসে খুব কাপ্তেনী ক'চ্ছে যে?"

"কি রকম?"

"আমার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হ'য়ে গেল, নাম লালমোহন রায়। কার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে। সুরেনবাবু ব'লে একটি লোককে দেখলাম, সে লোকটা ভারী সরল, তারই কিছু বাগাবার চেষ্টায় আছে।"

প্রভাত এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সুরেনের সংবাদ পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, সে যে এই জিনিসটাই খুঁজিতে খুঁজিতে এতগুলা দিন অতিকষ্টে কাটাইয়াছিল, আজ বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সেই লোকটার সংবাদ পাইয়া সে একটু কৌতূহলী হইয়াই কৌশলে সুরেনের ঠিকানাটা জানিয়া লইল।

বৃষ্টি একটু কমিতেই বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া প্রভাত যখন সুরেনের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন উষা বলিতেছিল, "এখনি তুমি বেরিয়ে যাও, নৈলে আমি চীৎকার ক'র্ব্ব।" কথাটা শুনিয়াই প্রভাত নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, এবং সুযোগ বুঝিয়া বাঘের মত লালমোহনের টুঁটি টিপিয়া ধরিল।

নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া লালমোহনকে দেখিতে না পাইয়া কিছুক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন লালমোহনকে ঐ অবস্থায়

দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ডাকিয়া লালমোহনকে ধরাইয়া দিল। বিচারে লালমোহনের ছয় মাস জেল হইয়া গেল। বেচারা তাহাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটা সাক্ষীও পায় নাই। প্রভুবৎসল সন্তোষ প্রভুর বিপদ দেখিয়া দেবতার নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিবার জন্য কোথায় যে সরিয়া পড়িল, আর কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দেবতা বুঝি তাহাকে প্রভুবৎসল দেখিয়া ছাড়িতে পারেন নাই।

৪০

শৈলকে হারাইয়া অবধি রাণীর মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এই বিবাহের আয়োজন, লোকের কোলাহল, হাস্য পরিহাসগুলা আজ তাহার বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল। দুঃখভারনম্রা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মত আসিয়া শৈলবালা যে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহা রাণীর চেয়েত' বেশী কেউ জান্‌তে পারেনি, তাই এ বিবাহের দিনেও যখন তখন তা'র চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বেচারা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে তা'র বিবাহ দেখিতে আসিয়া শৈল বিবাহের সময়েই কেন চলিয়া গিয়াছে। সে

যে শুধু সখীর মত নয়, গুরুর মত এসে তা'র কাছ থেকে ভক্তি আদায় ক'রে নিয়েছিল ; আজ তা'কে একটা কথাও না ব'লে যে সে চ'লে গেল, তার মানে কি এই নয়, যে রাণী তা'র একটুও ভালবাসা পায় নাই, যে রাণী তা'র মনে এমন একটা দাগও দিতে পারে নাই, যে সে যাবার সময় তা'র নামে একখানা চিঠিও লিখে রেখে যায়। তারপর তার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে সে সেদিন ব'লেছিল "রাণী, তোর বিয়ে দেখা আমার হ'ল না।" রাণী ভাবিল সে যাবার জন্য আগে থাকতেই তৈরি হ'য়েছিল, আমাদের ঘর বুঝি তা'র পছন্দ হ'ল না। রাণী প্রথমটা একটু কাঁদিল, তারপর অভিমানভরে মনে মনে বলিল, "হতচ্ছাড়ী যেখানে যাবি, শুধু কি হেঁসেই আগুন ধরিয়ে দিবি?" কিন্তু বিরক্তই হোক্ আর রাগই করুক্ বিবাহের দিনে শৈল'র অভাব তাহার প্রাণটায় বড়ই বেশী আঘাত দিয়াছিল। সে না হইলে তাহার বিবাহের একটা প্রধান অঙ্গহানি হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে এ বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু বিবাহ ক'রিতেই হইবে, এই বাধ্যতা আজ যেন তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিতেছিল। সে থাকিলে শ্বশুরবাড়ী যাবা'র সময় চোখথেকে একফোটা জল প'ড়তেও দিত' না এই ভাবিয়াই রাণীর চোখ দিয়া কত ফোঁটা জল পড়িয়া যাইতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন, "কাঁদিসনে

রাণী, সে নষ্ট দুষ্ট লোক ছিল, নৈলে সোয়ামী ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়?"

রাণী বলিয়া উঠিল, "ও কথা ব'লোনা মা! সে যদি নষ্ট দুষ্ট হয় তাহ'লে দেশে সতী নাই। তা'র প্রাণের দুঃখ তোমরা বোঝ নাই, আমি বুঝেছিলাম। সে যে কতখানি ব্যথা একমুখ হাসির নীচে লুকিয়ে ফেলেছিল, তা' তোমাদের চোখ এড়িয়েছিল, কিন্তু আমার চোখে ধূলা দিতে পারে নাই। তাকে প্রথম দেখেই যে আমার অশোকবনের সীতার কথা মনে হ'য়ে গিয়েছিল মা?" বলিয়াই ঝর ঝর করিয়া আরও খানিকটা কাঁদিয়া ফেলিল। মা চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অপরিচিতা মেয়েটার উপর রাণীর এতটা ভক্তি কি করিয়া আসিল, তাই ভাবিয়াই তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রভাত যে একদিনের মধ্যে কতখানি জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা প্রথম যখন সুরেন জানিতে পারিল, তখন শুধু প্রভাতের প্রশংসায় তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায় নাই, সঙ্গে সঙ্গে শৈল'র স্মৃতি দামোদরের বানের মত আসিয়া তাহার চক্ষু দিয়া সহস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সকালে উঠিয়া সে যখন চা দিয়ে যা 'উষা' বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল, তখন উষা আসিয়া বলিল "চা খাবে কি ? তোমার যে আজ বিয়ে দাদা ?"

"ওঃ আজ বুঝি আমার বলিদানের দিন" বলিয়া সুরেন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া যখন ঘরের মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, উষা বলিল "কি অকল্যাণের কথা বল যে তা'র ঠিক নেই দাদা ! তোমার না হয় বউ দরকার নাই, আমাদের আছে।" সুরেন ম্লান হাসিয়া তাহার মুখপানে তাকাইয়া বলিল "ওরা না বুঝলে না কিন্তু তুই আমার কাছে এতদিন র'য়েছিস, তুইও কি বুঝলিনা উষা, যে তা'কে ভোলা আমার পক্ষে কত শক্ত কতখ পাপ ?" বলিয়া সজল দৃষ্টিতে খোলা জানালার দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইল। সুরেনকে কাঁদিতে দেখিয়া উষাও কাঁদিয়া ফেলিল, "এদিকে এস" বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া প্রভাত যে কত জিনিষ

কিনিয়াছে তাহা দেখাইয়া বলিল "দাদা! বিয়ে কর, এ বিয়ে করা যে এখন তোমার কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।" সুরেন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে প্রভাত রাত্রের মধ্যে কখন যে তাহাকে লুকাইয়া বরের পোষাক হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের প্রত্যেক খুঁটিনাটী জিনিষটি পর্য্যন্ত কিনিয়া ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে মোটেই জানিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "তোরা সবাই মিলে আমায় পর ক'রে রাখ্‌বি, এ একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছিস্ ঊষা? আমায় দুটী ভাত দিতে তোর এতই কষ্ট হ'চ্ছিল রে?" কথাটা শুনিয়া ঊষা প্রথমে একটু হাসিল, বলিল "তুমি বুঝি বিয়ে ক'রে, আমাদের পর ক'রে দেবে ভেবেছ'? তা হ'চ্ছে না, তোমায় ছাড়বে কে দাদা?" বলিয়াই কি জানি কেন হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊষা আজ এই প্রথম কাঁদিল। আজ সুরেনের কথাগুলা যেন তাহার চোখে অশ্রুর বন্যা আনিয়া দিতেছিল। চোখ মুছিয়া সে বলিল."দাদা তুমিই ত' ব'লেছ',পরকে সুখী ক'র্ব্বার জন্য মাঝে মাঝে আত্মোৎসর্গ ক'র্ত্তে হয়, নৈলে পৃথিবীতে বড় হওয়া যায় না, আজ যে তোমার সেই পরীক্ষার দিন।"

"সব ভেবে দেখেছি ঊষা। তোদের সুখী ক'র্ব্বার জন্যই আমি বিয়ে ক'র্ত্তে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যে আগে থেকেই ভেবে

রেখেছি উষা, যে আমি যদি তা'কে যথার্থই ভালবেসে থাকি, আর সে যদি যথার্থ সতীসাধ্বীই হয়, তাহ'লে আমি আর কারও হ'তে পার্ব্ব না। আজ আমাদের পরীক্ষার সঙ্গে একটা প্রধান সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে।"

"কি ক'র্ব্বে তুমিই জান," বলিয়া উষা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(৪২)

সেদিন অপরাহ্নের পূর্ব্বেই যখন ব্যাণ্ড আসিয়া সমস্ত বাড়ী-খানি মুখরিত করিয়া তুলিল, সুরেন ছুটিয়া আসিয়া প্রভাতকে কোন কথা বলিবার সময় না দিয়াই বলিয়া উঠিল, প্রভাত বলিদান অনেক দেখেছি, কিন্তু বলিদানের বাজনা বেজে উঠ্‌লে দুর্ভাগ্য ছাগ শিশুর প্রাণ যে কি সুরে বেজে ওঠে, তা' আজই প্রথম বুঝ্‌তে পার্লাম, আর সেটা তোমরাই বুঝিয়ে দিলে। বলিয়া তেমনই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রভাত বলিয়া উঠিল, "তুমি কি পাগল হলে নাকি দাদা ?" কিন্তু সে কথা সে শুনিতেই পাইল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাজার মত পোষাক পরিয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন-চিত্তে বরবেশে সুরেন যে সময় বাটীর বাহির হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এক ভিখারিণী আসিয়া তাহার দরোজার সম্মুখে ভিক্ষা চাহিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সম্মুখে সেই চক্‌চকে রাজবেশ-পরিহিত বরকে দেখিয়া দুই পদ পিছাইয়া গিয়া ভূতগ্রস্তের মত কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু বরের পোষাক হইতে নড়িতে চাহিল না, মুখ দিয়া অসাবধানে অস্পষ্ট স্বরে বাহির হইয়া পড়িল, "আজই কি রাণীর বিয়ে ?"

"না, আজ ভিখারিণীর বিয়ে," বলিয়া সুরেন আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ভিক্ষার ঝুলিটা ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার এমন দশাও হ'য়েছে, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে উঠেছে"। প্রভাত পশ্চাতে আসিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল, "দাদা আগেই ব'লেছিলাম যে তোমাকে রাজার মত দেখাচ্ছে, এখন দেখছি সত্য সত্যই তোমার ভিতরে একটা রাজার প্রাণ আছে। দেখছি যে ঐশ্বর্য্য এসে আজ দারিদ্র্যের হাত ধ'রেছে, তা'কে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে।" সুরেনের সে দিকে কান ছিল না, সে শৈল'র হাত ধরিয়া বরাবর উপরে আসিয়া বলিল, "মাসীমা! বিয়ে ক'র্ত্তে আমার আর যেতে হ'ল না, ক'নে আপনিই এসে দেখা দিলে, এখন আশীর্ব্বাদ কর," বলিয়া মাসীমার পায়ের ধূলা লইল। শৈলও সেইখানে বসিয়া পড়িয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। মাসীমা আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, চোখের জলে তিনি দম্পতীর অভিষেক করিলেন। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া বলিলেন, "কিন্তু রাণীর কি উপায় হবে রে?"

"সে ব্যবস্থা ক'চ্ছি," বলিয়া সুরেন বাহির হইয়া গেল।

উষা একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সুরেন বাহিরে যাইবামাত্র সে আসিয়া শৈল'র কোলের কাছে বসিয়া প্রথম সম্ভাষণেই বলিয়া উঠিল, "এতদিন কোথায় ছিলি

পোড়ারমুখী, দাদা যে কৈলাস ত্যাগ ক'র্বার সঙ্কল্প ক'রেছিলেন।"

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "কি ভাগ্যি এমন অন্নপূর্ণা কাছেই ছিল।"

"আ মরণ আর কি? তোমার ঘর বজায় ক'র্বার জন্যই ত' বিশ্বেশ্বর আমায় পাঠিয়েছিলেন, এই থানেই ত' উষার জীবনের সার্থকতা। এখন দাও, একটু পায়ের ধূলো দাও, এইখানেই একটু জায়গা দিও," বলিয়া শৈল'র পায়ের ধূলা লইতে গেল। ভক্তিতে শৈলের চক্ষে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া সে বলিল "দাঁড়া তোর পায়ের ধূলোর সমান হই আগে।" বলিয়া উষার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

প্রভাতকে বিবাহ করিতে পাঠাইয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে আসিয়া সুরেন বলিল "উষা আজ আমার জীবনের মস্তবড় একটা সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে গেল। আমার অন্ধকার জীবনের পথ আলোকিত ক'র্ত্তে রাণী পারে না উষা, যে পারে সে "ভিখারিণী শৈল।"

পরিশিষ্ট

বাজনার শব্দ শুনিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া শৈল দরোজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, আর চতুর্দ্দোল মাটীতে নামাইবাত্র রাণী এমনভাবে ছুটিয়া আসিয়া শৈলকে জড়াইয়া ধরিল যে গাঁটছোলায় টান পড়িয়া প্রভাত আর একটু হইলেই পড়িয়া যাইত। কোলে উঠিয়াই রাণী শৈল'র কানে কানে বলিল, "কলিকালে কি রাধা নিজেই কৃষ্ণের কুঞ্জে এসে দেখা দেয় দিদি? না, অন্নপূর্ণা এসে মহেশ্বরের দ্বারে অন্নভিক্ষা করে? নিজের বরটীকে সামলাবার জন্যই বুঝি এত ছলনা ক'রে চ'লে এলে?"

"দূর পোড়ার মুখী তুই যে রাণী, ভিখারিণীর বরে তোর মন উঠ্‌বে না তাই তোর জন্যে রাজা পাঠিয়ে দিয়েছি, এইবার বর পছন্দ হ'য়েছে ত?"

রাণী সে কথা চাপা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা ব'ল্লে না কেন দিদি? তোমাকেই না হয় রাণী সাজিয়ে দিতাম?"

শৈল'র চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, গাঢ়স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "আমি রাণী হ'তে চাই না বোন্, আমি চিরদিন ভিখারিণীই থাক্‌ব'। ভিখারিণী সেজেই যে আমার জীবন সার্থক হ'য়ে গেছে রাণী, মুক্তি নেবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম,

জান্তাম না, যে বিশ্বেশ্বর এইখানেই আমার মহামুক্তির পথ খুলে রেখেছেন, বুঝ্‌তে পারি নাই যে শত সহস্র জাহ্নবী যমুনা আজ আমায় ছুঁয়ে মুক্ত হ'তে চাইবে, আমি অনেকদূর নেমে গিয়ে আবার যে স্বর্গে উঠেছি রাণী, তোরা সব রাণী হ'গে যা, আমি চিরদিন ভিখারিণীই থাক্‌ব। স্বামীর-চরণ-মুক্তির পথে মাথা রেখে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রেই আমি ম'র্ত্তে চাই, স্বর্গে যেতে চাই না এইখানেই যে আমার সকল স্বর্গের সেরা স্বর্গ আমায় কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে র'য়েছে রাণী।"

রাণী তাহার কোল হইতে নামিয়া দু'হাতে করিয়া শৈল'র পায়ের ধূলা লইয়া বলিল "দিদি! তোমাকে দেবী ব'লেই জান্তাম, আজ দেখ্‌ছি তুমি তার চেয়েও অনেক উঁচুতে, তোমার পায়ের ধূলো নিলে লোকে জন্মজন্মান্তর সতী হ'য়েই জন্মাবে।"

দূর্‌ পাগলি, আমি সেই ভিখারিণী শৈল।" বলিয়া শৈল আসিয়া উষার হাত ধরিল। উষা কিন্তু আজ একটাও কথা বলে নাই, চিরহাস্যময়ী উষা আজ বড়ই ম্লান হইয়া গিয়াছিল. কি জানি কেন আজ সে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, বুঝি দূরনিবদ্ধ-দৃষ্টি বালিকার বহুদিন-গত স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল, তাই আজ হাস্যময়ী উষার চোখে শুধু শিশিরবিন্দুর মত অশ্রুই দেখা গিয়াছিল, তেমনই নির্ম্মল, তেমনই স্বচ্ছ।

সম্পূর্ণ।